প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৪৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

ছবি : অরুণ রায়ের সৌজন্যে

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

ষোল টাকা

শ্রীশিবদাস সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এক

'যদি ভরিয়া লইতে কুম্ভ'—অর্থাৎ কুম্ভ যে কখনো পুরোপুরি ভরে নেওয়াও যায়—মৃগতৃষ্ণিকায় এ বিশ্বাস যুক্তিবাদী মনের কোন খাঁজটায় লুকিয়ে থাকে কে জানে! জীবনের শুকনো খাতে দাঁড়িয়ে এই নীরভরণের ডাক, এই ভরা জোয়ারের আহ্বান যখন বুকে বাজে তখন আর মাটিতে পা ফেলে এগোবার তর সয় না। চারদিকে দেয়াল-ঘেরা ঘরের ভিতরে ঘর—তারো ভিতরে ছোটবড় কত অসংখ্য কূটকক্ষের অবরোধ পেরিয়ে তৃষার্ত মন অচিরে উড়াল দেয় সেই পূর্ণতার মহাতীর্থে। কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে রাধা হঠাৎ বলেছিল, 'মিতুদি কুম্ভে যাবে?' কুম্ভে। সেই স্বপনপারের স্বর্গে! যেখানে কত সাধুসন্তের সমাগম, কত অলৌকিক সংঘটন, কত অভাবিত আশীর্বাদের অমৃতস্বাদ। সেই অমৃতযোগে আমি যাব। বঙ্গোপসাগরের দখিনা হাওয়ায় হঠাৎ হরিদ্বারের গঙ্গাতীরের ঘ্রাণ ভেসে এল। শেষ ফাল্গুনের তারাভরা আকাশে যেন ব্রহ্মকুণ্ডে সন্ধ্যারতির সমারোহ। এবারে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। কত লোকই তো যাচ্ছে। আমরাও গেলে হয়।

যাত্রাস্পেশালের অফিসে সুবলবাবু ফোন ধরেই বললেন, 'কুম্ভের টিকিট ছাড়া অন্য কথা বলুন।'

'আমার যে কুম্ভের টিকিটই চাই।'

'কেন মিছামিছি দুটো সীট নষ্ট করবেন। আপনাদের বদলে দুজন বৃদ্ধা যেতে পারেন, যাঁদের আর হয়তো যাওয়ার সময় আসবে না। আপনার যা বয়স, আরো দুটো কুম্ভ অনায়াসে কভার করতে পারবেন।'

রসিকতার উত্তরে এবার রুখে উঠতে হয়, 'আপনি নিশ্চিত করে সেকথা বলতে পারেন? তাছাড়া বেঁচে থাকলেও সুযোগ কি সবসময়

হয়? মন যখন টেনেছে এবারে আমি যাবই। সীট আমাকে দিতেই হবে।'

রণে ভঙ্গ দিয়ে শেষে ভদ্রলোক দুটো সীট কবুল করলেন। তবে সেইসঙ্গে এ-ও জানিয়ে দিলেন যে বয়োকনিষ্ঠের দলে, অর্থাৎ পঞ্চাশের নিচে আছি আমরা। অতএব লোয়ার বার্থের আবদার করা চলবে না। চলবে না থাকার জায়গা, বাথরুমের ব্যবস্থা অথবা খাওয়াদাওয়ার খুঁত ধরে কোন অনুযোগ অভিযোগ। এ-তো সাধারণ পরিস্থিতি নয়, এ-যে কুম্ভ। কথা শুনে মনের ভেতর হঠাৎ একটু ধাক্কা লাগে। এ-যে কুম্ভ! এখানে অব্যবস্থার অভিযোগ আবার করে নাকি কেউ! ট্রেনে দুঃসাধ্য ভিড়, ধর্মশালায় অপরিমিত অব্যবস্থা, তাঁবুতে সেতুতে উন্মুক্ত চড়ায় জলে-কাদায় উপচানো ভিড়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলাই তো এখানে প্রত্যাশিত। আসলে মনেই ছিল না যে সময় ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে। সভ্যতা পৌঁছে গেছে বোধহয় সর্বাধিক আরামের সময়ে। আর আমি সেই পঁচাত্তর-পঞ্চাশ বছর আগেকার কুম্ভমেলার বর্ণনা মনে নিয়ে ছিয়াশির কুম্ভমেলায় রওনা হচ্ছি। এমন ঠেক দিলে তাহলে পদে পদেই খেতে হবে। কুম্ভ মানেই শুধু বৈরাগী সাধু-সন্তের সমাগম, শুধু পুণ্যার্থী, ধর্মার্থীর নিবিষ্ট ভিড় এইরকম একটা ছবি মনের মধ্যে কি করে জানি না গড়ে উঠেছে। সেই যে রামদাস কাঠিয়াবাবাজীর ছাউনিতে গুরুসেবা আর সাধুসঙ্গের ব্রত নিয়ে এসে উঠলেন প্রখ্যাত আইনজীবী শিষ্য তারাকিশোর! পরবর্তীকালে সন্তদাস বাবাজীরূপে তাঁকেই আবার দেখি কুম্ভমেলার মহামণ্ডলেশ্বরের ভূমিকায়। কত রাজা মহারাজা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়েছেন নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর পায়ের তলায়। কত আতুর-তাপী কতদূর দেশ থেকে বোঁচকা বুঁচকি বেঁধে কত কষ্ট করে যাত্রা করেছে গো যানে অথবা নিরুপায়ে নিছক পায়ে হেঁটেই। দুঃসাধ্য বিশ্বাসের জোরে বরণ করেছে অকল্পনীয় দৈহিক কষ্ট। তাদের সেই অপরিসীম নিষ্ঠা, অন্তহীন আর্তি রূপ পেয়েছে

'কুম্ভ' শব্দটিতে। সে আর্তি ভবে ওঠার, সে নিষ্ঠা জীবনপণের। কুম্ভমেলা তাই শুধু এক ধর্মীয় সমাবেশ নয়, মুমুক্ষুগনের চিরন্তন ঐতিহ্য। ম'ৎবাসীর নিত্যকালের অমৃত পিপাসার প্রতীক। আজকের যুগের মানুষ আমি আধুনিক মতে যাত্রীস্পেশালে টিকিট কাটলেও মনের গভীরে সেই ঐতিহ্যের বহমান প্রভাব নিঃশব্দে কাজ করে যায়। বার বার একাকার হয়ে যায় বাস্তব আর কল্পনা। যাত্রাপথের প্রস্তুতি থেকেই এই আমার সমস্যা। আবার বোধহয় সবচেয়ে বড় পাওনার সূত্রও এখানেই।

এবারে কুম্ভস্নানের মুখ্য যোগ পড়েছে ইংরেজী হিসাবে চোদ্দই এপ্রিল। হারদ্বারে কুম্ভস্নানপর্বের সূচনা হয় শিবচতুর্দশী তিথি থেকে। তারপর দ্বিতীয় স্নান চৈত্র মাসে মৌনী অমাবস্যায়। আর প্রধান স্নান চৈত্রসংক্রান্তি (মহাবিষুব সংক্রান্তি)-র দিন। এবারে শিবচতুর্দশী পড়েছে আটই মার্চ। এই চতুর্দশী থেকে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত স্নানার্থীদের মেলাক্ষেত্রে কল্পবাস, সাধুসঙ্গ এবং সাধ্যমত সাধনভজনে দিনযাপন করাই বিধি। সাধু মহাত্মারা তাঁদের শিষ্য-বর্গের জন্য তাঁবু কুটিরের ব্যবস্থা করেন বিভিন্ন আশ্রম মিশনের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমরা এই কল্পবাসীদের দলে নই। মাসাধিক কাল ধরে কাজকর্ম সমাজসংসার ফেলে এভাবে দিন কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এতদিন ধরে আধুনিক জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি ছাড়া জীবনযাপন। কিন্তু মনে মনেও তো কল্পবাস করা যায়। আর সেই মানসকল্পের তো স্থানকালে বাঁধা কোনো সীমা নেই। যাওয়ার টিকিট হাতে আসার আগেই আমি মনে মনে কুম্ভমেলায় পৌঁছে গেলাম। বালির চড়ার ওপরে ক্যাম্পের ছাউনি গেরুয়া পতাকা ওড়ানো তাঁবুর সারি। সন্ন্যাসীদের সমাবেশ, ভজন কীর্তন গঙ্গাস্নান বিশ্বাসী দেহাতী মানুষের ভিড়ে ভিড়ে ঘুরে বেড়াই, উড়ে বেড়াই চারপাশের জীবনের খাটো গণ্ডির উপর দিয়ে। পনের দিনের নির্ধারিত

ভ্রমণসূচীর কত আগে শুরু হয়ে গেল আমার ভ্রমণ। মন যদি ভ্রমে পড়তেই চায়, কাগজে ছাপা টিকিটের সাধ্য কি তাকে ঠেকাবে।

কলকাতায় এবার বেশ তাড়াতাড়িই গরম পড়ে গেছে। কুম্ভে যাব শুনে অনেকেই ট্রেনে বিহার-উত্তরপ্রদেশের নামডাকওয়ালা গরমের ভয় দেখালেন। আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি কোথাও যাওয়ার প্রসঙ্গে অধিকাংশ শ্রোতাই বাধা দিতে চেষ্টা করেন। একদল বলেন, আগে বললে আমিও তো সঙ্গে যেতে পারতাম। আরেক দল মুরুব্বী সেজে নানা অসুবিধার ফিরিস্তি দিয়ে নিরস্ত করতে চান। আসলে এর পেছনে লুকিয়ে থাকে নিজে না যেতে পারার ক্ষোভ আসলে আমরা প্রত্যেকেই একটু বেড়াতে, একটু বদলাতে চাই স্টেশনে নিতান্ত অবাঞ্ছিত অতিথিকেও বিদায় দিতে এসে চোখে জল আসে, তার কারণ বিরহবেদনা নয় বঞ্চনাবোধের বেদনা আমি যেতে পারলাম না অথচ আরেকজন, আরো যে কতজন চলে যাচ্ছে—এই দৃশ্যই বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে। আর কুম্ভমেলা প্রসঙ্গে এই বঞ্চনাবোধ তো তীব্রতর হবেই। এতো শুধুমাত্র যাওয়া নয়, কুম্ভমেলায় যাওয়া। একাধারে পুণ্য আর পরিক্রমণ। তীর্থ তো শুধু নদীর নীরেই বাঁধা থাকে না, অসংখ্য মানুষের আকাঙ্ক্ষায় বয়ে যায় স্রোতস্বিনী হয়ে নিজের মনে সেই আকাঙ্ক্ষার আকুলতা পরিমাপ করে এবারে আমি সব হিতার্থীদের মনে মনে ক্ষমা করে দিলাম। এমনকি যে দায়িত্বসচেতনা আমাকে মেয়ের বিয়ের আগে (মেয়ের বয়স দশ বছর) কুম্ভমেলায় যেতে নিষেধ করেছিলেন তার ভয় আমি না ফিরলে আমার মেয়ের দায়িত্ব কে নেবে, তাঁকেও আমি উল্টে প্রশ্ন করিনি আজ সন্ধ্যায় আমাকে গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা মিনিবাস চাপা দিলে আমার মেয়ের দায়িত্ব নেবে কে! আসলে আমরা নিজের মনে মনে এইভাবে যে কতবার করে মরি। এই যে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুর ক্ষুদ্রতা থেকে চেতনাকে বাঁচাতে পারে যে

অমৃত, অনাগতকাল থেকে কোন কুম্ভ পূর্ণ করে সে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে কে জানে।

মাঝে মাঝে একটু তত্ত্বচিন্তার শৌখিনতা করলেও, জীবনযাত্রার মৌলিক দায়িত্ব তো কিছুটা থেকেই যায়। সেই ঝামেলাগুলো যত তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা যায় ততই ভালো। কুম্ভমেলার মতো জনবহুল তথা বিশৃঙ্খল তীর্থে যাবার প্রথম প্রস্তুতিই হল সংক্রমণ প্রতিরোধী টিকা নেওয়া। কাগজে দেখেছিলাম যে মেলা কর্তৃপক্ষ এবারে এ বিষয়ে সরকারীভাবে কোনো বিধিনিষেধ রাখেননি। প্রতিষেধক টিকার বদলে প্রতিরোধক পরিচ্ছন্নতার ওপরেই জোর দিতে চান তাঁরা। মিথ্যে সার্টিফিকেটের ঠুলিতে চোখ ঢেকে দায়িত্ব এড়ানোর চেয়ে এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভালো। তবে এ ব্যাপারে নিজের স্বার্থেই নিজের পক্ষ থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া আরো ভালো। কাজেই গলির মোড়ের ওষুধের দোকানে গিয়ে টি. এ. বি. সি.-র অ্যাম্পুল চাইলাম। কাউন্টারের পেছন থেকে ভদ্রলোক অবাক হয়ে [illegible]ন। 'টি. এ. বি. সি.-[illegible] অনেকদিন বন্ধ হয়ে [illegible] [illegible] এখন দেওয়া হয় না।'

টি. এ. বি. সি. দেওয়া হবে না [illegible] মানে [illegible] বসন্তের [illegible]। টিকা [illegible] [illegible] থেকে [illegible] হয়েছে। আমাদের [illegible] এ [illegible] [illegible] জানা [illegible] কাগজওয়ালারা এত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থবিষয়ক সংবাদ যে কেন ছাপায় না জানি না। পাশে বসে থাকা পরিচিত ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'কিছু ক্লোরোস্ট্রেপ আর ইলেকট্রাল নিয়ে যান। ছোটখাটো কিছু হলে ওতেই ঠেকাবে। আর ভিরুলেন্ট যে টাইপটা আছে কলেরার, ওটা ইনজেকশনেও আটকায় না।'

ও, অবমানন তারা আছে, রাতের অন্ধকারে তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। আমার বিমূঢ় ভাব দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর যদি মন না মানে তবে কর্পোরেশন থেকে কলেরার ইনজেকশনটা নিয়েই যান।'

'আর টাইফয়েড ?'

'ওটা হ'লে তো কলেরার মতো তখন তখনই কিছু হবে না। ক'দিন সময় পাওয়া যাবে। তারমধ্যে আপনি কলকাতায় চলে এসে চিকিৎসা করাতে পারবেন।'

এরকম যুক্তিযুক্ত পরামর্শের পর আর কোনো প্রশ্ন তোলা চলে না। আমি কর্পোরেশনের কলেরার ইনজেকশন নিয়ে বাড়ি ফিরি।

এইবার গোছগাছ। গরমকাল কাজেই গরমজামার ঝামেলা নেই। মোটামুটি পুরোনো আর ঘন জংলা রং বেছে শাড়ীজামা ব্যাগে ভরি। হারিয়ে গেলে দুঃখ নেই, ময়লা হলে নজর কাড়ে না স্নানযাত্রার এ-ই উপযুক্ত পোশাক।

এরই মাঝে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ রাধার ফোন এল, 'মিতুদি আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

'সে কি, কবে ?'

'আজই, রাত নটায় ট্রেন। প্রবীর এসেছে আমাকে নিতে।'

'প্রবীর এসেছে! খুব ভালো কথা। খুব ভালো খবর দিলি রাধা। এমনি ভালো যেন চিরদিন থাকিস্।'

জবাবে রাধার গলা ছলছলিয়ে ধরে আসে। মেয়েটা বড় ভালো, বড় নরম। প্রবীর যে এসে ওকে নিয়ে গেল এ বড় ভালো হ'ল।

কিন্তু আমি এখন করি কি! যাওয়ার আর একসপ্তাহও নেই। এরমধ্যে সঙ্গী পাই কোথায়! যাত্রীস্পেশালে একা গেলেও অবশ্য অসুবিধে নেই! কিন্তু শারীরিক সুবিধেটাই তো সব নয় একা বেড়াতে যাওয়া ব্যাপারটা ভাবতেই যেন কেমন বিশ্রী লাগে মনে হয়, আমার কেউ নেই, আমার জন্য কারো চিন্তা নেই। একবার কি একটা নামকরা সিনেমার লোভ ছাড়তে না পেরে আমি একা গিয়েছিলাম। তারপর সে কী বিরক্তিকর অবস্থা! যে কোনো ভালো জিনিস উপভোগ করতে চাই ভালো সঙ্গীর সান্নিধ্য। আবেগের মুহূর্তে

পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে 'আহ্' বলতে না পারলে সে যে কী ভয়ানক অস্বস্তি। মনে হচ্ছিল যেন চারপাশের লোকেরা সবাই আমার অস্বস্তি দেখে মজা পাচ্ছে। চোরা চোখে আমাকেই বার বার ফিরে ফিরে দেখছে। যাত্রীস্পেশালে অবশ্য ঠিক এরকম বাক্‌বিনিময়-হীন একা হবে না। পরস্পরপরিচিত হলেই একাকী যাত্রীদের সেখানে একটা আলাদা দল হয়ে যাবে। আর সেই দলে যদি বেমালুম মিশে যেতে না পারি, এবং অবধারিত যে তা আমি পারবো না - তাহলে আমার অবস্থাটা হবে আরও বেশী করুণ। একযাত্রায় পৃথক মনকে কেউ ক্ষমা করে না। আর এজন্যই এযাত্রায় সঙ্গী হতে ডাকা যায় বড় কম জনকেই। দু-চারঘণ্টার দেখাশোনায় কারও সঙ্গেই ভদ্রতা বজায় রাখা কঠিন নয় কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ওঠা-বসা, ঘোরা-ফেরায় যে সঙ্গী হবে, সে যদি মনোমতো না হয় তবে বড় জ্বালা। সাজানো ভদ্রতা একটু পরেই সাজখুলে ফেলবে। ঘরের সঙ্গীর বোধ হয় আমার বিপন্ন মুখ দেখে করুণা হ'ল। হাসতে হাসতে বললেন, 'চলো আমিই তোমার সঙ্গে ঘুরে আসি।'

'তুমি যাবে। কাজকর্ম ফেলে! আমার সঙ্গে কুম্ভে!'

আমরা যাবো শুনে এর আগে মন্তব্য করেছিলেন যে বেকার লোকদেরই এসব শখ মানায়। আজ বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি না গিয়ে কি করি; জানো না, স্বামী স্ত্রীর যে হাত ধরে একসঙ্গে ডুব দিতে হয়। নইলে কুম্ভ পূর্ণ হয় না।'

পূর্ণ-শূন্যের হিসেব মেলানো বড় দায়। কম বয়সে নলভরার অঙ্কে অনেক ধন্ধে পড়েছি ঠেকে ঠেকে এটুকু শিক্ষা হয়েছে যে নিশ্চিত মিলিয়ে দেখার চেয়ে অনেক সময় না দেখে ছেড়ে দেওয়াতেই অনেক বেশী স্বস্তি। তাতে অন্তত সম্ভাবনার আনন্দটুকু থাকে। ব্যবসায়ীর রক্তে হিসেব নাচে। কিন্তু বাইরেকার শরীরের রক্ত-স্রোতের গভীর যে অন্তর্গত ধারা ধমনীতে বয়ে যায়, সেখানে আনন্দ

আমার চেয়ে অনেক বেশী বেহিসেবী। এতদিন যাওয়া-না যাওয়ার দোলাচলে উল্টো কথা বলছিলেন এখন মন ঠিক করে ফেলা মাত্র উৎসাহে আমার চেয়েও অনেকখানি এগিয়ে গেলেন। মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। জলের বোতল থেকে শুরু করে ক্যামরার ফিল্ম যোগাড়, টাকা খুচরো করা, মেয়েকে তার মাসীর কাছে জিম্মা দেওয়া। তাছাড়া ঘরদোর বন্ধের নিয়মিত ঝামেলা ত' আছেই। সাত তারিখে দুপুরে ট্রেন। ফর্টি নাইন আপ অমৃতসর এক্সপ্রেস ছাড়ে সওয়া একটায়। দুপুরের খাওয়া ট্রেনেই। কাজেই সকালবেলায় বাড়িতে ঝামেলা নেই। বেলা বারোটায় সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘড়ির নিচে দাঁড়াবার কথা। ছোটবেলায় স্কুলে কঠিনতম শাস্তি ছিল অফিস ঘরে ঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা। স্কুলের ছাত্রী আর দিদিমণিদের সঙ্গে বাইরের অভিভাবকরাও অফিসে এসে ওইখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে একটু কটাক্ষ করে যেতেন। এখনো ঘড়ির নিচে দাঁড়ানোর কথায় কেমন একটু অস্বস্তি হয় পৌনে বারোটা নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছে দেখি ঘড়ির নিচে কেন, তার কাছাকাছিও দাঁড়াবার জায়গা নেই। বয়স্ক মহিলা-পুরুষরা ট্রাঙ্ক বিছানা সাজিয়ে গুছিয়ে বসে পড়েছেন। পানের ডিবে, জর্দার কৌটো চালাচালি হচ্ছে কিছু সুবেশা তরুণী ও স্মার্ট যুবক প্রজাপতির মতো বাচ্চাদের হাত ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন এঁরাও কি কুম্ভের যাত্রী নাকি! আনন্দ আমাকে বকতে লাগলেন, মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত আমি যত বলি, ওর তো কুম্ভসম্বন্ধে কোনো বোধই নেই। শুধুশুধু এই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে কষ্ট দেওয়া কেন! আনন্দের যুক্তি, না বুঝে আগুনে হাত দিলে শিশুর হাত কি পোড়ে না! তেমনি সবার সঙ্গে গিয়ে একটা ডুব দিলে কিছু বুঝুক না বুঝুক মনের মধ্যে একটা ছাপ তো পড়বে! ট্রেন স্টেশনে ঢুকলো। স্পেশালের ছাপ মারা কামরায় সকলে উঠতে লাগলেন। এতক্ষণে বোঝা গেল এইসব তরুণ-তরুণীরা বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন মা-বাবা অথবা শ্বশুর-শাশুড়ীকে

ট্রেনে তুলে দিতে। তাঁদের যথাস্থানে অধিষ্ঠিত করে এবং সহস্রবার সাবধানে থাকতে বলে এবং তাঁদের কাছেও একই উপদেশ শুনে, শেষ মুহূর্তে মনে পড়া জলের মগ, চিরুনি, জদার কৌটো ইত্যাদি কিনে দিয়ে তাঁরা বাচ্চাদের হাত ধরে নিচে নেমে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতব্যাগে বা পকেটে রুমাল রেডি। ট্রেন ছাড়ামাত্র নাড়াতে হবে। এই দৃশ্যটা ট্রেন থেকে দেখতে বড় ভালো লাগে। আমাদের জন্য কেউ রুমাল নাড়াচ্ছে না, কিন্তু আমি সকলের জন্যই হাত নেড়ে দিলাম।

একটা বড় থ্রি টায়ার কামরা আমাদের দখলে। মুখোমুখি দুই সারির নিচের বার্থগুলির মধ্যে তক্তা ঢুকিয়ে ফরাসের আকার দেওয়া হয়েছে। আমার সামনের ফরাসে পাঁচজন মাসীমা চাদর বিছিয়ে গুছিয়ে বসে গেলেন। ধারের বেঞ্চে ইরাদি আর আমি। ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তে খাবারের থালা হাতে ধরিয়ে দিল। ভাত, ডাল, ভাজা তরকারি, চাটনি আর দৈ। খাওয়াটা ভরপেটই হ'ল। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে একটি নিটোল ভাতঘুম দেব ভেবেছিলাম তা আর হ'ল না। রোদের তাপে কামরাটা একেবারে অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠেছে। দেওয়াল আর ছাদ থেকে প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে। বাঙ্কে খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থেকে শেষে উঠে বসতে বাধ্য হলাম। নিচে ঝালরকাটা সিল্কের চাদর বিছিয়ে ইরাদি দিব্য সুখশয়নে নিদ্রা দিচ্ছেন। কাজেই নেমে আসার উপায় নেই। ওপরে বসে বসেই সামনাসামনি আলাপ পরিচয় চলল। আনন্দ উঠেছেন আমার মাথার দিকে বাঙ্কে। তাঁর নিচের ফরাসে আর একদল দাদাবৌদি। গড়িয়াহাটে পাশাপাশি কাপড়ের দোকান আছে এঁদের। তাঁরা বড় বড় বেডকভার জলে ভিজিয়ে খসখসের মতো টাঙিয়ে তাঁদের ঘেরটুকুতে খানিকটা স্নিগ্ধতা এনেছেন। আনন্দর আবার লাইট ট্র্যাভেলিং-এর বাতিক। আমার তো পেতে শোবার চাদরেরই অভাব। তোয়ালেটা ভিজিয়ে মাথায় দিয়ে বসে রইলাম। ঘড়ির কাঁটায় চারটে বাজতে চা এল। রোদের

তাপে দুপুর তখনো সমান প্রখর। সারা দুপুরের উত্তাপ জমে জমে সবচেয়ে অসহনীয় অবস্থা তখন। বিকেল গড়াতে ধীরে ধীরে কামরার ভিতরের আলো বাইরের তুলনায় কমে আসে আর মনে হয় গুমোট যেন আরো বেশী করে চেপে ধরে। জানলা দিয়ে মাথা বের করলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার স্পর্শ। এই সময়টায় কেমন যেন কথা বলতেও ইচ্ছে করে না, নিঃসঙ্গ অন্ধকারে বড় মন কেমন করে। ইরাদি চা-পানের পর প্রসাধন শেষ করে তাস হাতে এসে সামনের ফবাসে বসে পড়ে আরতিদিকে ডাকলেন আরতিদি জানলার পাশ থেকেই বসে বসে গান ধরলেন, 'সন্ধ্যা হল গো ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।' প্রথমে চলতি গাড়ির আওয়াজে কথাগুলি কানেই আসছিল না। ধীরে ধীরে সারা কামরায় সুরের নম্র অথচ নাছোড় টান বিস্তারিত হতে লাগল। এপাশে ওপাশের খোপগুলিতে কলগুঞ্জন থেমে এল।

'ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায়
হারিয়েছে গো

ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধার মাঝে হোক না জড়ো।'

তাকিয়ে দেখি ওপাশের জানালার বাইরে অস্ত সূর্যের আলোয় মাখামাখি। ছাইয়ের সঙ্গে পরতে পরতে গাঢ় গোলাপী মিলিয়ে কি আশ্চর্য রং আকাশের আরতিদির গলায় সুরের চেয়ে বেশী ঝরে আবেগ গান দিয়ে তিনি মনকে ভুলিয়ে নয়, ভুলিয়ে দিতে পারেন শুনতে শুনতে কি যেন পাওয়ার স্নিগ্ধ আবেশে ভরে ওঠে।

'আমায় ঘিরে আমায় তুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি
আমার বলে যা আছে মা, তোমার ক'রে সকল হরো'

ততক্ষণে কামরার মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। চলতি গাড়ির স্নিগ্ধ হাওয়ার ঝলকে আচমকা নাম না জানা ফুলের সুবাসে ভরিয়ে দিল। আরতিদি থামতেই ওপাশের বাঙ্কের ওপর থেকে পাখির মতো মিষ্টি চড়া সুর ভেসে এল 'মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন ক্ষণে।' ভদ্রমহিলার দিকে এতক্ষণ ভালো করে

চেয়েই দেখিনি। পাঞ্জাবী ফর্সা রং-এ লালচে খাটো চুল, নাকে তীব্রদ্যুতি একটি নীলাভ হীরে আর আঁটো নীল চুড়িদার পোশাকে তীক্ষ্ণ যৌবনা এই রমণীকে ভুলেও বাঙালী মনে হয়নি। সালোয়ার কামিজ পরা আর একটি যুবতীর সঙ্গে ইনি সারাক্ষণ তিন তাসের খেলায় নিমগ্ন ছিলেন। দুজনের সংলাপ থেকে যে দু-একটি বাঁকানো সুরের ইংরাজী অব্যয় কানে গেছে তাতে মোটেই বেশী উৎসাহিত বোধ করিনি। রবীন্দ্রসংগীতের কলিই পারে খুব নিষ্ঠুর ঠোঁটকেও মুহূর্তে আন্তরিকতার মোহে ভরিয়ে দিতে। দুচোখ বুজে গান শুনতে শুনতে আমার মনে মনে মহিলাটির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল—

'নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে।'

দুই

হরিদ্বারে পৌঁছতে বেলা প্রায় আটটা হ'ল। অমৃতসর এক্সপ্রেস আমাদের কামরাটাকে ভোরবেলাতেই লাক্সারে ছেড়ে দিয়ে গেছে। বাকী পথটুকুর জন্য গাঁটছড়া বাঁধতে হ'ল এক লোকাল ট্রেনের সঙ্গে। মেলা উপলক্ষ্যে এখন হরিদ্বার আর লাক্সারের মধ্যে দিবারাত্রিই অসংখ্য ট্রেন চলাচল করছে। ট্রেনে ও স্টেশনে অস্ত্রধারী প্রচুর গার্ড। পাঞ্জাবের গোলমালের পরিপ্রেক্ষিতে এবার কুম্ভমেলায় নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর ব্যবস্থা হয়েছে জনস্বাস্থ্যরক্ষার। স্টেশন থেকেই দেখছি পায়ের নিচে জমি ব্লিচিং পাউডারে একেবারে সাদা। অসংখ্য ঝাড়ুদার ক্রমাগত রাস্তা সাফ করে চলেছে। কোথাও এতটুকু আবর্জনা, অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ে না। স্টেশনে সাইডিং-এ বেশ কয়েকটি যাত্রীভরা বগি দাঁড় করিয়ে

রাখা আছে। কিন্তু চারপাশে কোথাও এতটুকু ময়লা পড়ে নেই। দশ তারিখের পর থেকে অবশ্য এইসব বগিও আর এখানে রাখা হবে না। তখন আর দূরপাল্লার কোনো ট্রেনকেই হরিদ্বার পর্যন্ত আসতে দেওয়া হবে না। লোকাল ট্রেনগুলিই শুধু লাক্সার পর্যন্ত অনবরত চলাচল করবে। স্টেশনের প্রচণ্ড ভিড়ের চাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এ ব্যবস্থা। আমরা অবশ্য ভিড়ের আগে এসে পরে ফেরবার দলে। অর্থাৎ ক'টা দিন সময় পাওয়া যাবে ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখে নেবার, স্থির হয়ে দুদণ্ড নিজের মুখোমুখি বসে থাকার। ভিড় যেমন চারদিকে ঘিরে ধরে তেমনি আবার চারদিক থেকে অবকাশও দেয়। দু-চারজনের সঙ্গে সময় কাটালে সবটুকু সময়ই তাদের দিতে হয়। ইচ্ছে করলে একা হওয়া যায় জনতার মাঝেই এজন্যই আমার তীর্থস্থানে পালে-পার্বণেই যেতে ভালো লাগে। নির্বিশেষ অসংখ্যের চালচিত্রে বিশেষের ছবিটিকে ফুটতে দেখা যায় স্পষ্ট করে আজ মৌনী অমাবস্যার বিশেষ স্নান। স্টেশন পেরিয়ে বাইরে আসতেই পড়ে গেলাম জনারণ্যের অ[illegible]বান আবর্তে অসংখ্য লোক চলেছে ব্রহ্মকুণ্ডের পথে [illegible] ট্রাঙ্ক, কাঁখে [illegible] দোলানো ঘাগরা পরা [illegible] মহিলা কনুইয়ের ধাক্কায় [illegible] পথ করে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। হাতের পোটলা পুঁটলি সামলে [illegible] পারি সরে [illegible] নারীকে কেন শক্তিরূপিণী বলা হয় এঁদের দেখলে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। আর এইসব জায়গায় এঁদেরই ঠিক মানায়। মোটা মোটা কাকন, বাঁকমল আর কানবালার তেজী সঞ্চালনে মেলার সঠিক চরিত্রটা ফুটে ওঠে। কলকাতার ফ্যাকাসে সাজ আর [illegible] নিয়ে এই ভিড়ের মধ্যে আমরা যেন একেবারে অস্তিত্বহীনভাবে মিলিয়ে যাই। চারদিকে কিন্তু এখন কোনো সাধুবাবাকে দেখা যাচ্ছে না বললেও চলে। তাঁরা আগেই এসে যাঁর যাঁর আসনের স্থান নির্দিষ্ট করে বসে গেছেন। গঙ্গার

ওপারে সাধুদের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় সারি সারি তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে পরিচ্ছন্নতার, পানীয় জলের। ব্যবস্থা হয়েছে পুরী তরকারির আহার্য বিতরণের। অর্থাৎ সাধুরা এখানে সরকারী প্রশাসনের অতিথি। যে সব সাধুদের মঠ-সম্পত্তি, শিষ্য-অনুগামীর অভাব, তাঁরা এই ব্যবস্থায় নিশ্চিন্তে কল্পবাস করতে পারছেন আর প্রতিষ্ঠাপন্ন স্বামীজিরা তো সর্বাধুনিক আরামপ্রদ তাঁবু খাটিয়ে শিষ্যসেবক নিয়ে সমারোহের সঙ্গে কুম্ভস্নানপর্ব উদ্‌যাপন করছেন। স্টেশন থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল ঝকঝকে এক মার্সিডিজ বেঞ্জে চড়ে চলেছেন বহুমূল্য সিল্কের গেরুয়া পরা সুদর্শন দুই স্বামীজি। জানালার ওপরে প্রসারিত হাতে শোভা পাচ্ছে চলতি মডেলের বিদেশী ঘড়ি।

ওমা, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি গাড়ি থেকে এক সাধুবাবাই ক্যামেরা তাক করে ধরেছেন আমাদের দিকে। অর্থাৎ আমাদের কাছেই শুধু তাঁরা দর্শনীয় নন, আমিরাও তাঁদের কাছে চেয়ে দেখার যোগ্য। শুধু চেয়ে দেখাই বলি কেন, সেই দেখাকে ক্যামেরায় ধরে রাখারও যোগ্য। দানহীন অনিশ্চয়ের ভাবটা চলে গিয়ে মনের মধ্যে বেশ একটা আত্মপ্রসাদের অনুভূতি এল। স্টেশনের চত্বরের সামনেই নীলবর্ণ মহাদেবের আবক্ষ মূর্তি। কয়েক বছর আগেই তৈরী হয়েছে দেখেছিলাম, বেমক্কা রং-এর জন্য মনেও রেখেছিলাম। এবারে মেলা উপলক্ষে বিচিত্র রঙের বর্ণপ্রলেপে মনে হচ্ছে প্রমথনাথকে তাঁর নিজস্ব অনুচররাই যেন রঙ্গ করে সাজিয়ে দিয়েছে। সামনে আর একটু এগিয়ে গঙ্গাধর মহাদেবের সেই পরিচিত বিগ্রহ। জনসংঘট্টের ব্যস্ততার মাঝে নির্বিকার বসে নিজের শিরে অবিরাম জল ঢালছেন। তাঁরও গলায়, হাতে সর্প আর রুদ্রাক্ষের ভূষণে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের আরোপে উৎসবসজ্জা করা হয়েছে। গুণাতীত, বর্ণাতীত, দিগম্বর মহেশ্বরের কর্পূরধবল অঙ্গে এটুকু বর্ণলেপও যেন মানায় না। অন্ততঃ হরিদ্বারের মতো পীঠস্থানে হিমালয় আর

ভাগীরথী যেখানে উদাসীন সৌন্দর্যের বিশাল পটভূমি ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, সেখানে রঙে রঙ মেলানো বড় কঠিন। গৌরীশিখরে পার্বতীর তপস্যার ছবি আঁকতে বসে কালিদাস নয়নপ্রান্তে কেবল একটি সূক্ষ্ম শ্যামরেখ টেনেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন 'অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্।' কবিশিল্পীর ধ্যানলব্ধ এ সংযম, এ সংগতিবোধ অবশ্য নগরশিল্পীর স্থূল তুলিতে আশা করাই অন্যায়। বরং বোধহয় এ স্থূলতাটুকুই তাঁর গুণ। নাগরিক সাধারণকে খুশী করার ‑সদ।

হরিদ্বারে শেষ এসেছিলাম তিনবছর আগে। এতদিনের চেনা পুরোনো শহরটা এই অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ যেন অনেকখানি বেড়ে গিয়ে একেবারে নতুন রূপ ধরেছে। গ্রাম্য বালিকা যেন হয়ে উঠেছে যুবতী নাগরী। রূপের বিলাস বেড়েছে, হারিয়ে গেছে সৌন্দর্যের কমনীয়তা। কুম্ভমেলা তো হরিদ্বারে নতুন ঘটনা নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রায় বারো বছর বাদে বাদে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই মহাপর্ব। নতুন হ'ল এবারের কুম্ভমেলার জন্য এই প্রচণ্ড নাগরিক প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির সবটাই সশব্দে ঘোষণা করছে যে আমরা এগিয়ে এসেছি। অনেকখানি এগিয়ে এসেছি পুরোনো দিন থেকে, পুরোনো জীবন থেকে।

কিন্তু কুম্ভমেলাতে যে আমরা পিছিয়ে আসতেই চাই। সেই খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য কুম্ভমেলার বর্তমান ঐতিহ্যের পত্তন করেছিলেন। অমৃততীর্থে অবগাহন উপলক্ষে সর্বসম্প্রদায়ের সাধুসন্তেরা নিয়মিত কালের ব্যবধানে একত্র হবেন। আর সেই সাধুসমাবেশকে উপলক্ষ করে সমবেত হবে সাধারণ মানুষ। শ্রদ্ধা আর করুণার বিপরীতমুখী ধারায় মিলে যাবে সন্ন্যাস আর সংসার। সেই মিলনতীর্থের কল্যাণবারিতে হৃদয়কুম্ভ ভরে নেওয়ার আহ্বানে আজ পর্যন্ত সাড়া দিয়ে আসছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ। কোনো শাস্ত্রীয় বিধি না থাকলেও কুম্ভস্নান

আজকের ভারতবর্ষের ব্যাপ্ততম ধর্মযজ্ঞ। সমুদ্র মন্থনের সেই পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে এর রচনা। সুরপতি ইন্দ্র চলেছিলেন শোভাযাত্রা করে রাজহস্তীর পিঠে। পথে দেখা হ'ল ঋষি দুর্বাসার সঙ্গে। সুরেন্দ্রকে সমাদর দেখিয়ে নিজের কণ্ঠের পারিজাতমালটি খুলে ছুঁড়ে দিলেন ঋষি। ইন্দ্র কৌতুকছলে মালা লুফে নিয়ে স্থাপন করলেন প্রিয়বাহন গজরাজের সুসজ্জিত মস্তকের অগ্রভাগে। কি জানি কি খেয়াল হ'ল গজপতির, সজোরে মস্তক সঞ্চালন করে ফেলে দিল সেই মালা। তারপর সেই ভূপাতিত মালা পদতলে বিমর্দিত করে এগিয়ে গেল কুঞ্জরগমনে। সেই দৃশ্য দেখে মুহূর্তে উদ্দীপিত হয়ে উঠল দন্ত' দুর্বাসার দ্বিতীয় রিপু। দেবরাজকে অভিশাপ দিয়ে তিনি বললেন, স্বর্গরাজ্যের যে অমিত ঐশ্বর্যের অহংকারে আমার কণ্ঠের মালার অবমাননা করতে তুমি সাহসী হলে, সেই ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী আজ থেকে স্বর্গ ত্যাগ করে পাতাল-বাসিনী হবে। অমোঘ ঋষিবাক্যে কমলা অচিরে স্বর্গত্যাগ করে নিমজ্জিত হলেন জলধিতলে। শ্রীভ্রষ্ট হ'ল স্বর্গলোক। শ্রীপতি বিষ্ণুর উদ্যোগে তখন আয়োজন হ'ল সমুদ্র মন্থনের। মন্দার পর্বতকে দণ্ড এবং বাসুকি নাগকে রজ্জু করে সুরাসুর বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে মন্থন শুরু করলেন। সেই মহামন্থনের ফলে পাতাল থেকে নানা অমূল্য নিধির সঙ্গে উঠে এল কালান্তক হলাহল। চতুরচূড়ামণি নারায়ণ তখন দেবাদিদেবকে কৈতববাদে তুষ্ট করে অগ্রভাগস্বরূপ সেই কালকূট বিষ নিবেদন করলেন তাঁকে। আশুতোষ সে গরল গলাধঃ-করণ করে নীলকণ্ঠরূপে সৃষ্টি রক্ষা করলেন। তারপর এল অমৃতকুম্ভ। নারায়ণ গোপনে সে কুম্ভ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের হাতে তুলে দিয়ে তাকে বললেন সেটি নিয়ে পালিয়ে যেতে। যাতে অসুররা তার সন্ধান না পায়, যাতে সে অমৃত শুধু দেবতাদেরই ভোগ্য হয়। দানবরা অবিলম্বে এই প্রতারণা বুঝতে পেরে জয়ন্তের পশ্চাদ্ধাবন করল। তখন সেই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবদানবের মধ্যে শুরু হ'ল

তুমুল লড়াই, বারোদিনব্যাপী সেই যুদ্ধকালে অমৃতবহনে ক্লান্ত হয়ে জয়ন্ত বারোটি স্থানে সেই কুম্ভ নামিয়ে রেখে বিশ্রাম করেন। তারমধ্যে আটটি স্থান হ'ল স্বর্গে এবং চারটি মর্তে। পৃথিবীর ঐ চারটি স্থানে কুম্ভ থেকে চলকে পড়া অমৃতবিন্দুস্পর্শে অমৃততীর্থের উদ্ভব হয়। সেই চার মহাতীর্থ হ'ল—হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড, প্রয়াগে ত্রিবেণী সংগম, নাসিকের গোদাবরীতীর এবং ধারা বা উজ্জয়িনীর শিপ্রানদীর ঘাট। স্বর্গের বারো দিনকে মর্তের হিসাবে বারো বছর ধরে বারো বছর অন্তর ঘটে পূর্ণকুম্ভযোগ। এই বারো বছর গণনা করতে হয় বৃহস্পতির এক এক রাশিতে অবস্থানের সময়কে এক এক বৎসর ধরে। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত দ্বাদশ মাসের বর্ষ গণনার হিসেবে নয়। ঐ দ্বাদশ দিনব্যাপী দেবাসুর সংগ্রামের সময়ে জয়ন্তকে অমৃতরক্ষায় সহায়তা করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি, সূর্য এবং চন্দ্র। পশ্চাদ্ধাবনকালে দৈত্যরা যাতে অমৃতকুম্ভ বিনষ্ট না করতে পারে সেজন্য বৃহস্পতি সেটি রক্ষা করছিলেন। দৌড়ানোর সময় কুম্ভ থেকে অমৃত যাতে না পড়ে যায় তা দেখার ভার ছিল চন্দ্রের উপর। আর কুম্ভটি যাতে না ভাঙে সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সূর্য। সূর্য চন্দ্র ও বৃহস্পতি সে সময় যে যে স্থানে যে যে রাশিতে থেকে অমৃতকুম্ভ রক্ষা করেছিলেন, সেই স্থানে সেই সেই রাশিতে তাদের অবস্থানের কালেই কুম্ভযোগ অনুষ্ঠিত হয়। হরিদ্বারে কুম্ভযোগের সময় বসন্তকালে বিষুবসংক্রান্তিতে -

বসন্তে বিষুবে চৈব ঘটে দেবপুরোহিতে

গঙ্গাদ্বারে চ কুম্ভাখ্যঃ সুধামাপ্নুবন্তি নরোযতঃ ॥

মর মানুষের পক্ষে সুধা বা অমরত্বলাভ করার উত্তম যোগ কুম্ভ। এসময় দেবপুরোহিত বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করেন। আর বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ ঘটে মেষরাশিতে।

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ

গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামাতদোত্তমঃ।

হরিদ্বার কুম্ভের গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, এখানে স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না—

কুম্ভরাশিগতে জীবে যদ্দিনে মেষগেরবৌ
হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জনং ॥

প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয় মাঘমাসে। বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য মকররাশিতে অবস্থান করলে এবং তিথি অমাবস্যা হলে প্রয়াগে কুম্ভযোগ ঘটে--

মেষরাশিগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ
অমাবস্যা তদাযোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে।

--নাসিকে গোদাবরীতটে কুম্ভযোগের কাল শ্রাবণমাসের অমাবস্যায়। বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র তখন কর্কটরাশিতে অবস্থান করেন—

কর্কে গুরু স্তথা ভানুশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাস্তদা কুম্ভো জায়তে হবনীমণ্ডলে ॥

উজ্জয়িনীতেও কুম্ভযোগ হয় অমাবস্যায় শ্রাবণমাসে। যখন বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র তুলারাশিতে অবস্থান করেন—

ঘটে সুরিঃশশিসূর্য্যাঃ কুহ্বাম্ দামোদরে যদা।
ধারায়াঞ্চ তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ ॥

অনুমান করা হচ্ছে যে এবারে প্রয়াগ কুম্ভে আগমন হবে সত্তর লক্ষ মানুষের। কিন্তু ভিড় দেখে, ক্রমাগত যে অসংখ্য মানুষের উত্তাল বন্যা শহরের বুকে আছড়ে পড়ছে তার অনুপাত দেখে মনে হয় শেষপর্যন্ত এই যাত্রীসংখ্যা হয়তো পৌঁছবে এককোটিরও ওপরে। হরিদ্বারের মতো ছোট শহরে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা যে কি কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে সরকারী প্রশাসন সত্যিই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন। শ্রাবণমাসের তারকেশ্বর অথবা মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের উদ্দাম অব্যবস্থার রাজ্য থেকে এসে

এই বিপুল ব্যবস্থাপনার সুশৃঙ্খলিত প্রয়াস দেখে সত্যি অবাক লাগে। আসলে ঐ সব জায়গায় প্রণামীর অংশভাগের অছিলায় দায়িত্ব বিভাজনের পথে দায়িত্ব এড়াবার রাস্তাটা প্রথম থেকেই খোলা থাকে। কিন্তু এখানে তো প্রণামীর কোন পর্ব নেই। কাজেই আয়ব্যয়ের আপেক্ষিক অনুপাতে নয়, নিছক আবশ্যিকতা অনুযায়ীই ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। আর সে ব্যবস্থাপনার অনেকখানি দায়ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। ফলে ধনবলে, জনবলে এবং প্রশাসনিক সামর্থ্যে--তহবিলের পরিমাণ নিয়ে কোনদিকেই দ্বিধা করতে হয়নি।

নয়ই এপ্রিল হরিদ্বার স্টেশন থেকে বেরিয়ে আর মাটি দেখতে পাইনি। চারদিকে শুধু মানুষ। এতলোক, গায়ে গায়ে এত অসংখ্য লোক যে কারও গলার নিচে আর দৃষ্টি যাওয়ার উপায় নেই। অত্যধিক ভিড়ের এই মজাটা এবার হরিদ্বার এসেই টের পেলাম। পর্বদিনে কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহে ভিড় যথেষ্টই দেখেছি। কিন্তু সেখানে ভিড়ের চাপে নাভিশ্বাস ওঠে, মজা টের পাওয়ার আর অবসর থাকে না। কিন্তু হরিদ্বারের পথের এই প্রচণ্ড ভিড় বড় সুনিয়ন্ত্রিত, ভিড় থাকলেও বিশৃঙ্খলা সেই অনুপাতে মোটেই নেই। বড় রাস্তা ছেড়ে এমনকি অলিগলির ভিতরেও একটু দূরে দূরেই নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ মোতায়েন। রাস্তার মাঝে মাঝেই দড়ি বেঁধে জনস্রোতের যাওয়া আসার দ্বিমুখী পথকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় ধাক্কাধাক্কির অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট স্রোতের বিপরীত দিকে কেউ যাবার চেষ্টা করলেই হুইসিল বাজিয়ে লাঠি হাতে পুলিশ এগিয়ে আসে। কাজেই ভিড়ের গতিতে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে অপঘাতের আশঙ্কা কম।

আমাদের বাসস্থান স্টেশনের কাছেই। সোজা রাস্তা দিয়ে ডানদিকে প্রথম গলির মাঝামাঝি মনোহরধাম নামে যাত্রীনিবাস। তিনতলা প্রশস্ত বারান্দার কোলে দুটি ঘর। বড়ঘরে মুখোমুখি দুই সারিতে কুড়িটা গদি বিছানো। মেয়েরাই দলে ভারী। তাই ঐ

ঘরটাই আমাদের দখলে এল। ছোটঘরে স্থানাভাব হওয়ায় জনতিনেক বৃদ্ধ মেসোমশাইকেও মহিলামহলে চলে আসতে হ'ল। এইসব ঠিকঠাক হতে না হতেই গঙ্গাস্নানের তাড়া লেগে গেল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, গুপ্তপ্রেস পি এম বাগচী, বেণীমাধব শীল—কত যে পঞ্জিকা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে কত যে মতভেদ এবং মত-বিশেষের অন্ধ ভক্ত আছেন যে কতজন—তা আজকের সকালের আগে জানতে পারিনি। কেউ বলছেন অমাবস্যা সাড়ে আটটায় ছেড়ে যাবে। কেউ বলছেন আটটা চল্লিশে। কেউ কেউ আবার নিশ্চিন্তে চা খেতে বসলেন, তাঁদের মতে সাড়ে নটা পর্যন্ত সময় আছে। আর সাড়ে দশটা অথবা দশটা পঞ্চান্নর দলে যাঁরা, তাঁরা তো বিছানা বিছিয়ে একটু গড়িয়ে নেবার তাল করছেন। আমি কোনো পঞ্জিকাই দেখে আসিনি। শুধু দেখতেই এসেছি এখানে। সামনে যে দলটি রওনা হচ্ছিল তাদের সঙ্গেই ভিড়ে গেলাম।

শোভনাদির বাবা সারাক্ষণ জপতপ পুজোআর্চা নিয়েই আছেন। ট্রেনে মাঝরাত্রি থেকেই স্তবপাঠ শুরু করেছিলেন। স্নানের পথেও গঙ্গাষ্টক আবৃত্তি করতে করতে চললেন—

সকল কলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে
তরলতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥

পথে যত লোক চলেছে হয় গঙ্গার দিকে, নয় গঙ্গা থেকে স্নান করে ফিরছে। সমস্ত শহরের এই একমন, এক ভাবনার স্রোত মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য একাত্মবোধের অনুভূতি আনে। মানুষ ভৌম তীর্থে যায় আসলে মানসতীর্থে উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তীর্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি সাধুজনের পবিত্র সান্নিধ্য মনের তামসিক ভাবনার অন্ধকারে সাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার আলো জ্বেলে দেয়। সংসারী মানুষের মনে এ আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিতই সাময়িক। কিন্তু সেই সামান্য সময়টুকুই বিস্তারিত জীবৎকালের উজ্জ্বলতম ঐশ্বর্য। শেষ চৈত্রের খররৌদ্রে ওপারের নীলপর্বত ঝলসে

যাচ্ছে। চাম্পেয় গৌরী গঙ্গার চঞ্চল অঙ্গে ঠিকরে উঠছে অসংখ্য হীরকখণ্ড। শঙ্করাচার্য আট বছর বয়সে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। সেই বালসন্ন্যাসীর চেতনায় কি গভীর কবিত্ব, কি অপরূপ সৌন্দর্যবোধ নিহিত ছিল তার পরিচয় আছে 'হিম-বিধু-মুক্তা-ধবলতরঙ্গে' ভাগীরথীকে নিয়ে লেখা একাধিক স্তোত্রে।

মজ্জন্মাতঙ্গ কুম্ভচ্যুত-মদমদিরামোদমত্তালিজালং
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচবিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্ম্মুনীনাং কুশ কুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং॥
পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরমকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্

এর চেয়ে মধুরতর বর্ণনা কি কালিদাসের লেখনীতেও সম্ভব ছিল! শুধু রূপে নয়, স্বরূপেও আমাদের মনে গঙ্গাচেতনা এনে দিয়েছেন এই বিবিক্ত সন্ন্যাসী। আমার ভাবনায় অনিবার্যভাবেই ভগীরথের সঙ্গে তাঁর ছবি বার বার এক হয়ে যায়। উত্তপ্ত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের হিমশীতল জলে নামতেই কি স্নিগ্ধ শান্তি ছড়িয়ে গেল সর্বদেহমনে। ওঁ শান্তি, শান্তি। নন্দলাল বসুর আঁকা গোমুখে গঙ্গাবতরণের স্নিগ্ধ ছবিটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সদ্য শিবজটাভ্রষ্ট সুরধুনীর নীলনির্জন ধ্যানরূপে মিলিয়ে গেল রৌদ্রতপ্ত ব্রহ্মকুণ্ডের শব্দিত চলচ্ছবি। এই পাথরে বাঁধা জলকুণ্ডের সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে যেন 'ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর জুড়ালো / আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো।' অথচ এই গণ্ডী বাঁধা স্রোতের ক্ষুদ্র সীমাটি লক্ষ্য করেই তো এতদূর ছুটে এসেছি। হঠাৎ যখন মনে পড়ে যায় কি ক্ষুদ্র আমাদের আকাঙ্ক্ষার সীমা, কতবড় সম্ভাবনাকে আড়াল করেই না সে দাঁড়িয়ে আছে - তখন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে উঠি। তবে সে বোধও ক্ষণিকের, সে লজ্জাও ক্ষণিকের। আবার গণ্ডিবাঁধা সীমায় সফরী বিচরণ করে আত্মতৃপ্তির মুগ্ধ আরামে, অজ্ঞান আনন্দে।

তিন

একথাটা প্রায় আমাদের মনেই থাকে না যে, ব্রহ্মকুণ্ডের এই ধারাটি গঙ্গার স্বাভাবিক স্রোতোপথ নয়; আদিতে গঙ্গা ছিল মূলতঃ নীলধারার পথে প্রবাহিতা। হরিদ্বারের ওপারে দক্ষিণ থেকে এসে ঘন মেঘের মতো নিবিড় বর্ণ যে গিরিশ্রেণী পূর্বদিক বেষ্টন করে হৃষীকেশের দিকে চলে গেছে, তারই গা ঘেঁষে নীলধারার স্রোত বয়ে গেছে কনখলের দিকে। মধ্যভাগে প্রবা হত আর একটি ধারা হর-কি-প্যারীর পূর্বতট বিধৌত করে বয়ে চলেছে। আর তৃতীয় ধারাটি উত্তরদিক থেকে এসে পশ্চিমে একটু বেঁকে ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়ে দক্ষিণদিকে গিয়ে আবার মধ্যবর্তী ধারাটির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মকুণ্ডের দৈর্ঘ্য মোটামুটি আড়াইশো ফিট এবং চওড়াও প্রায় দুশো ফিটের মতো। তলভূমি পাথরে বাঁধানো। কুম্ভমেলার আগের পূজাবকাশে যাঁরা হারদ্বারে এসেছেন, ব্রহ্মকুণ্ডের জলশূন্য প্রস্তরময় রূপই তাঁরা দেখে গেছেন। বর্ষাশেষে জলধারা রুদ্ধ করে দিয়ে কুণ্ডের পলি ও আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। সেজন্য এখন জল একেবারে অনাবিল স্বচ্ছ। ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে জলতলের পাথরের নুড়িগুলির আকারও স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে গঙ্গার গভীরতা বেশী নেই। এজন্য মাঝে মাঝে প্রায়ই চড়া পড়ে যায়। এমনি এক বিশাল চড়াই ব্রহ্মকুণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করত। বিড়লারা সেই চড়াটিকে ভালোভাবে বাঁধিয়ে হর কী-প্যারীর সোপানাবলী নির্মাণ করে দিয়েছেন: প্রবাদ যে পুরাকালে এখানেই ছিল মহাদেবের তপস্যার আসন। তাই ভক্তেরা হর-কি-পৌড়ী অর্থাৎ হরের সিঁড়ি বলতেন এ স্থানটিকে। বাঙালীর রসতরল জিহ্বায় পৌড়ী ক্রমে 'প্যারী'তে পরিণত হয়ে শিবপ্রিয়া গঙ্গার মহিমার সঙ্গে রোমান্সের মায়া যুক্ত করে দিয়েছে। জটাজাল

বিচ্যুতা প্রিয়া জাহ্নবীর যাত্রাপথের পাশে নির্মোহ প্রেমিক দেবাদিদেব যেন এখানে ধ্যানের আসন পেতেছেন।

কথিত আছে যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। স্বয়ং মহাবিষ্ণু সেই যজ্ঞে আবির্ভূত হন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ব্রহ্মা যে বিশাল কুণ্ড খনন করিয়েছিলেন, এই সেই ব্রহ্মকুণ্ড। মহাভারতের যুগে রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে এই পবিত্র-কুণ্ডের জলের মধ্যস্থলে এক মঞ্চ নির্মাণ করেন। গঙ্গার পূত অঙ্কে সেই মঞ্চের উপর বসে পরীক্ষিত মহর্ষি শুকদেবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। মোগলযুগে সম্রাট আকবর মানসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেহাবশেষ ব্রহ্মকুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে সেখানে এক বেদী নির্মাণ করিয়ে দেন। এখন ব্রহ্মকুণ্ডের জলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব অংশে নারায়ণের মন্দির আছে। পশ্চিমতীরের জলতল থেকে গেঁথে তোলা গঙ্গাদেবীর মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দির অপরিসর সেতুপথে সংলগ্ন। ব্রহ্মকুণ্ডের উপরে উত্তরদিকে বিষ্ণুপদচিহ্ন এবং তার ঠিক পূর্বদিকে গঙ্গাধর মহাদেব বিরাজিত।

ব্রহ্মকুণ্ডে এখন জলের গভীরতা ও স্রোত দুই-ই কম। ভীমগোড়ার ব্যারেজ ছাড়াও ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক উত্তরে স্থাপিত দুটি লকগেটের সাহায্যে জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কুম্ভের ভিড়ে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যই এ সতর্কতা। কিন্তু জলে নেমে স্থির হয়ে অবগাহন করা হ'ল না। লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় গায়ের জোরেই স্নানার্থীদের অবিলম্বে জল থেকে ঠেলে উঠিয়ে দিচ্ছে। শুনলাম যে সাধুদের মিছিল আসার সময় হয়ে গেছে। তাঁদের জন্য স্নানের ঘাট খালি করে দিতে হবে, পরিষ্কার করে দিতে হবে—'আমার এ ঘর বহু যতন করে / ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।' হায় তবু তো সঠিক জানা নেই এপথে সে আসবে কিনা—বড়ো যে অনিশ্চিত সেই পরমের আবির্ভাব, নিছক যদির উপর নির্ভর, 'যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।' ঘাটে উঠে তড়িঘড়ি কাপড় পাল্টাতে

পাল্টাতে দেখি হর কী-প্যারীর চারদিকের প্রশস্ত অঙ্গন একেবারে জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। জলের কিনারা থেকেই সারি সারি মানুষ বসে পড়েছে এদিকে। ওপারের ঘাট পথ সব পেরিয়ে পাহাড়ের ওপরেও অসংখ্য মানুষ। শোভনাদিরা ভিড়ের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরলেন। ঘাটের সীমা পেরোতে না পেরোতেই দেখি স্বেচ্ছাসেবক আর পুলিশবাহিনী বড় বড় ঝাড়ু এনে জল ছড়িয়ে সমস্ত পথ পরিষ্কার করতে লাগলেন। সাধুমহাত্মারা আসবেন। তাঁদের জন্য পথ পরিষ্কারের এই সেবা দেখে ভারী ভালো লাগল। আর একটু দেরি করে এলে এই লগ্নে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করার আর সুযোগ হত না। সুযোগ হত না সাধুদের অভ্যর্থনার এই নিবেদিত দৃশ্য দেখার। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে গঙ্গার ধারের রাস্তায় নেমেই চোখে পড়ল জাহ্নবী মার্কেটিং কম্‌প্লেক্সের ছাদে অসংখ্য মানুষের ভিড়। ওখান থেকে সমস্ত দৃশ্যটাই ভালোভাবে দেখা যাবে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে ওদিকে এগিয়ে যেতে দেখে আনন্দও সঙ্গে আসেন। এতদিনের অভিজ্ঞতায় জানেন পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে নিষেধ করা মানেই আরো বিপদ ডেকে আনা। আগুনকে নির্বাধ জ্বলতে দিলেই বরং তাড়াতাড়ি ছাই হয়ে যায়। কম্‌প্লেক্সের ভেতরে ঢুকে আর পথ খুঁজতে হ'ল না। ছাদে যাবার পথে বিশাল লাইন। লাইনের পিছনে পিছনে উপরে উঠে দেখি প্রশস্ত চত্বরে আর তিলধারনের স্থান নেই। গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে অসংখ্য লোক। প্রাচীরের একেবারে সামনে বসে আছেন কয়েকসারি মানুষ। মনে পড়ল নিচে থেকে দেখেছিলাম প্রাচীরের বাইরে বেশ চওড়া প্যারাপেট আছে।' বহুক্ষণ ধরে চড়া রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্রমূর্তি 'ভাইসাব' 'বহিনজী'দের অনেক অনুনয় বিনয় করে কোনোরকমে প্রাচীরের সামনে পৌঁছে সোজা নেমে গেলাম প্যারাপেটে। দেখাদেখি আরও কয়েকজনও নেমে এলেন। দেয়াল ঘেঁষে একসারি হয়ে বসে পড়লাম। প্যারাপেট কতটা শক্ত আর কতটাই

বা শোভা কে জানে। এতখানি অপরিণামদর্শিতা আবার আনন্দের চোখে সহ্য হয় না। তিনি গম্ভীর মুখে ছাদের একেবারে মাঝখানে সিঁড়ির ছায়ায় গিয়ে বসে রইলেন।

হাতের ভিজে কাপড় মাথায় চাপিয়ে বসে আছি। কি তীব্র রোদ। চেয়ে থাকলে মনে হয় সামনের নদী, পাথর, রাস্তা, ব্রীজ সব যেন ঝলসে যাচ্ছে। প্রাচীরের ওপর বসে থাকা মহিলারা ইতিমধ্যে আমাদের কাঁধের ওপরে পা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ক্রমেই আরও লোক নেমে আসছে প্যারাপেটে। ভয় হতে লাগল শেষে আনন্দের আশঙ্কাই না সত্যি হয়। দুর্বল প্যারাপেট এতগুলি পুণ্যার্থীর ভার যদি না সইতে পারে। হঠাৎ দেখি লাঠি উঁচিয়ে এক পুলিশও নামছে। এইবার বোধহয় আমাদের এখান থেকে তাড়াবে। লাঠি গায়ে ঠেকার আগেই উঠে পড়তে হবে। সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম পুলিশপুঙ্গব ঘুরে ফিরে চারদিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করে শেষে একেবারে নদীর মুখোমুখি কোণে পজিশন নিয়ে বসে পড়ল। অর্থাৎ ডিউটি ছেড়ে সে এখন সাধুদর্শনের পুণ্য অর্জন করবে। হঠাৎ হৈচৈ শুরু হ'ল —'ওই আতা হৈঁ, ওই দেখো, ওই উধার।' হর কী-প্যারীর পেছনের উত্তরদিকের সেতু দিয়ে সাধুরা আসছেন। এতদূর থেকে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু লাল, হলুদ, কমলা, সাদা কাপড়ের বিশাল শোভাযাত্রা। মাঝে মাঝে আছেন নাগা সাধুরা। তাঁদের ভস্মমাখা শরীরে দুলছে উজ্জ্বল বাসন্তী অথবা গেরুয়া গাঁদাফুলের মালা। নেড়ামাথা, জটাধারী, ত্রিশূল হাতে, কমণ্ডলু—চিমটা হাতে কতরকম যে বেশবাস। মাঝে মাঝে এক একজন মণ্ডলাধিপতি আসছেন দোলায় চেপে। তাঁদের মাথায় সোনারুপোর কাজকরা ছত্র ধরেছেন শিষ্যবৃন্দ। হাতী ঘোড়া ইত্যাদি শোভাযাত্রার যানবাহন ব্রীজের নিচে রেখে শুধু পায়ে হেঁটে অথবা দোলায় হর-কী-প্যারীতে পৌছাচ্ছেন সাধুরা। সেখান থেকে আর একটি ব্রীজে এপারে এসে গঙ্গামন্দিরের পাশ দিয়ে স্নানে

নামছেন। স্নানান্তে আবার দক্ষিণের সেতু দিয়ে হর-কী-প্যারী অতিক্রম করে পূবের মেলাক্ষেত্রে চলে যাচ্ছেন। সাধারণত সবাই শান্তমুখ, স্বচ্ছন্দগতি। কয়েকজন নাগা সাধু চপলতা করে উড়িয়ে দিচ্ছেন গাঁদার মালা, ছুঁড়ে দিচ্ছেন কমলালেবু। প্রসাদ কুড়িয়ে নিতে সমান হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে সারি বেঁধে দাঁড়ানো জনতা আর তাদের নিয়ন্ত্রক পুলিশবাহিনীর মধ্যে। বেশীর ভাগ সাধু জলে নেমে কয়েকটা ডুব দিয়েই উঠে আসছেন। কেউ কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রজপ করছেন। তরুণ কেউ কেউ এধার ওধার জল ছিটিয়ে একটু সাঁতারও দিয়ে নিচ্ছেন। নাগাসাধুরা পাড়ে উঠে সিক্তদেহেই দুহাতে করে বিভূতি মেখে নিচ্ছেন। ভেজা গায়ে চন্দনের মতো রং আর শুকিয়ে গেলেই খড়ির মতো সাদা হয়ে ফুটে উঠছে। হঠাৎ ব্রীজের উঁচু টাওয়ার থেকে নেমে একজন বিদেশী ফোটোগ্রাফার ঠিক তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করে ধরলেন। হৈহৈ করে কয়েকজন সাধু ঘিরে ধরলেন তাঁকে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম দূর থেকেই—কি জানি শেষে কি মারধোর খাবে বিদেশী সাংবাদিক। ওমা. দেখি গাঁদার মালা ঠিকঠাক করে সাধুবাবারা হাসিমুখে পোজ্ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন ছবি তুলতে। অসংখ্য সাধুর দলের পরে দল আসছে আর স্নান সেরে চলে যাচ্ছে—এই পর্ব চললো প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে। মনে পড়লো আমাদের বাসস্থানে পঞ্জিকার সময় নিয়ে নানা মুনির মতভেদ। এই সাধুরা কি শাস্ত্রজ্ঞানে অথবা নিষ্ঠায় তাঁদের চেয়ে কম! সূর্য এতক্ষণে ঠিক মাথার ওপরে। এতক্ষণ একটানা রোদের তাপে মাথা টনটন করতে শুরু করেছে। মাথার ওপর ভিজে কাপড় শুকিয়ে খড়মড় করছে। শেষ সাধুটি চলে গেলে যখন উঠে দাঁড়ালাম, হঠাৎ দেখি হর-কী-প্যারীর সিঁড়িতে বসে থাকা অসংখ্য মানুষ একবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গঙ্গার বুকে। ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচির সে দৃশ্য এতদূর থেকেও আতঙ্ক জাগায়। সাধুদের স্নান করা পবিত্র জলে অবগাহন করে টাটকা টাটকা পুণ্য

অর্জন করছেন এঁরা। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে পৃথিবীতে প্রবাহিত হতে প্রার্থনা করলেন, তখন গঙ্গা বলেছিলেন যে, তাহলে যত তাপী সকলে আমার সলিলে স্নান করে তাদের দুষ্কৃতিভার আমাকে অর্পণ করবে। সেই সম্মিলিত পাপভার আমি বহন করব কি করে! তখন বিষ্ণু বললেন, পাপীরা স্নান করে তোমাকে কলুষিত করবে সত্য, কিন্তু সাধুরা স্নান করলে তাঁদের পুণ্যস্পর্শে তুমি আবার কলুষমুক্ত হয়ে পাবনী হবে। সেই সাধুস্পর্শপূত পাবনী গঙ্গায় স্নান করতে লোকের এই উন্মত্ততা। পথে এখন যত ভিড় সব গঙ্গার দিকে। বিপরীত দিকের খালি পথ দিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে ফিরে আসি আমাদের আবাসে।

স্নান সেরে এসে সকলেই এবারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। পুরো দুদিনের ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি এবং কুম্ভমেলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজানিত আতঙ্কের অবসানে সকলেই এখন বেশ রিল্যাক্সড্। আয়েসী মেজাজে সকলে মিলে রবিদার পেছনে লেগেছে। স্নানের ঘাটে রবিদার ছেড়ে রাখা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচশো টাকা কে তুলে নিয়েছে। বৌদিকে দাদা বলেছিলেন পাঞ্জাবিটা দেখতে। পকেটে টাকা আছে বলেননি। বৌদি চুল ঝাড়তে ঝাড়তে, ঘাটের শিবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেছেন পাঞ্জাবিটা যথাস্থানেই আছে। পাশেই কাপড় বদলানোয় ব্যস্ত তিনজন ঘোমটাবৃতা লজ্জাশীলার হাতসাফাইয়ের নৈপুণ্য মোটে বুঝতেই পারেননি। এখন দাদার কাছে বকুনি খেয়ে উল্টে বকে উঠলেন, আমায় একবার বলতেও তো পারত যে ওতে টাকা আছে তাহলে আমি টাকাটা হাতেই রাখতাম; সেটা কিছুতেই খুলে বলবে না— পাছে আমি কিছু নিয়ে নেই! বেশ হয়েছে সবটাই ওরা নিয়ে গেছে। সবাই মিলে এখন রবিদাকে বকছেন অকারণে অতটাকা পকেটে নিয়ে স্নানে যাবার জন্য। এই ভিড়ের মধ্যে টাকাকড়ি স্পেশালের ম্যানেজারদের কাছে জমা রেখে গেলেই সবচেয়ে ভাল। কাগজে,

টি. ভি. তে তো বার বার সাবধান করে বলা হয়েছে যে কুম্ভমেলায় ধর্ম করতে যেমন অসংখ্য লোক এসেছে তেমনি আবার বহুলোক এসেছে অধর্মের উদ্দেশ্যে। আরতিদি বলেন, 'সেই পৌরাণিক কুম্ভের ব্যাপারটাই তো অধর্মের কাহিনী। একে তো প্রথমে বিষ্ণু জয়ন্তকে অমৃতকুম্ভ অপহরণ করতে বললেন। তারপর বারোদিনের যুদ্ধে জিতে গিয়ে যখন অসুররা অমৃত পান করতে উদ্যত হ'ল তখন মোহিনীমূর্তি ধরে তাদের ছলনা করে কুম্ভের অমৃত সব দেবতাদের পরিবেশন করে দিলেন। অপহরণ আর কুম্ভের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিরকালই চলছে চলবে।' পাঁচশো টাকার বিনিময়ে এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা শুনে রবিদা কতটা খুশী হন জানি না; কিন্তু বৌদিসহ আমরা সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে থাকি। স্পেশালের পরিচারক গৌরহরি আর নারায়ণ মধ্যাহ্নের ভোজের থালা সাজিয়ে নিয়ে এল। বাইরের বারান্দায় প্রশস্ত জায়গা আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ঘরের বাসিন্দাদের যাতায়াতের মাঝে বসে খেতে স্বস্তি নেই। যে যার শোবার গদিতে বসে থালা টেনে নিলাম। এই গদিই এখন আমাদের দেওয়ান-ই তখত্। খাওয়া, বসা, শোওয়া সবই এর উপরে। বাণীদি অবশ্য নিজের গদিটা গুটিয়ে তুলে রেখে মাটিতেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন বিধবা মহিলা আমাদের দলে আরো কয়েকজন আছেন। কিন্তু এতটা আচারী কেউ নন। মনুষ্যশরীর ধারণ করলে কতগুলি অবশ্যকরণীয় শারীরিক কৃত্য কিছুতেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে কি ভাবে সেগুলিকে স্বাস্থ্য ও সুরুচিসঙ্গতভাবে নির্বাহ করা যায়। কিন্তু সভ্যতার চেয়ে যখন সংস্কার বড় হয়ে ওঠে তখন ওই দুটিই মার খায় সকলের আগে। খাওয়া শেষ করে এসে দেখি বাণীদি দরজার কোণে একটা সেলোফেনের প্যাকেট সন্তর্পণে গুঁজে রাখছেন। জিনিসটা কি দেখবার খুব কৌতূহল হচ্ছে। এরমধ্যে মণিকা এসে হাতে ভাজা মসলা ধরিয়ে দিয়ে গল্পে টেনে নিল। মণিকা হচ্ছে ট্রেনের সেই

কিন্নরকণ্ঠী রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময় প্যান্টশার্ট পরার অপরাধে মহাজাতি সদন মঞ্চে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পাননি। ভবিষ্যতে খোলা মনে জিন্‌স্‌-জামা পরিহিত মেয়েরা রবীন্দ্রসংগীতে মেতে থাকবে এই তাঁর আশা তাঁর মতে তাতে বৃহত্তর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতেরই জয়। রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে নিজের মতো করে নেওয়া মণিকাকে দেখে আমার বার বার সেই কথাটিই মনে পড়ে যায়। গঙ্গায় স্নান করে উঠে মণিকা পরেছে কমলায গোলাপীতে মেশানো নাইলনের ম্যাক্সি। উজ্জ্বল হেলেতেলে মেকাপের ওপর গাঢ় লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে যখন তখন গেয়ে উঠছে, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে' অথবা 'কি পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।' বেশভূষার সঙ্গে মানানসই ওর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি গানগুলির পরিচিত অর্থে যেন নতুন তৎপর্য যোগ করে দেয়। সুদৃশ্য হোল্ডারে মৃদুগন্ধী সিগারেট ধরিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে বলে, 'এই তুই আমার কিছু মনে করছিস্‌ নাতো?' মনে আবার করব কী। আমার তো ভারী মজা লাগতে থাকে। আমাদের মাথার উল্টোদিকে বাণীদির মাথা। ওঁর সেলোফেন প্যাকেটের রহস্য এতক্ষণে আমার জানা হয়ে গেছে। ওর মধ্যে আছে কয়েকটা ঘুঁটে. হ্যাঁ ঘুঁটে। সেই প্রাণীবিশেষের অপকর্মজাত কুটিরশিল্পের শুকনো সংস্করণ। আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যজাতীয় প্রাণীদের সমস্ত অপকর্মের অশুচিতার প্রতিষেধকরূপে বাণীদি ওগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। দরকারমতো একটু জলে গুলে ছিটিয়ে নিলেই হবে. আমি বলি, 'ও বাণীদি, এই গঙ্গার দেশে আবার গোবরের দরকার কি. গঙ্গাজলেই ত সব শুদ্ধ হয়।' বাণীদি জবাব দেন না। বোধহয় শুধু গঙ্গাজলের চেয়ে গোবর-গঙ্গাজলের কম্পাউণ্ড অ্যাকশনের ওপর ওঁর বিশ্বাস বেশী। আমার জ্যেঠিমা বিশেষ পূজো-আর্চার সময়ে লোক পাঠিয়ে কাশীর ষাঁড়ের গোবর সংগ্রহ করতেন। কলকাতার ষাঁড় অথবা

গাইগোরুর গোবরের চেয়ে ওই ইমপোরটেড্ বস্তুর উৎকর্ষের কারণটা কি জেনে নেবার ইচ্ছে থাকলেও প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। বাণীদিকেও বেশী ঘাঁটাতে সাহস হয না। পুণ্যবতীদের আবার ব্রহ্মতেজ জিনিসটা একটু বেশী পরিমাণে থাকে তো। তার চেয়ে বরং মণিকার মুখাগ্রের ওই সুগন্ধি আগুন অনেক বেশী নিরাপদ। বাণীদিব পাশে আমার মাথামাথি শুয়েছেন ইরাদি বয়স বাণীদির চেয়ে কম হবে না। কিন্তু সযত্ন দেহচর্চা আর নিপুণ প্রসাধনের শাসনে পঞ্চান্নকে পঁয়ত্রিশের গণ্ডিতেই আটকে রেখেছেন। উচ্চবিত্তঘবের গৃহিণী। কর্তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ককটেল বা ডিনারপার্টি সাজানোব মাঝে সময় কাটান মহিলাসমিতিতে নৃত্যনাট্য করিয়ে। বাণীদির সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা চালানো ওঁব পক্ষে মুশকিল। ব্যাগ থেকে অতিমূল্যবান সুচারু একটি চশমা বের করে খানিকক্ষণ পিস্তশ হাতে এক রূপসীর ছবিশোভিত পেপারব্যাক পড়লেন। তারপর মণিকাকে ডেকে বললেন 'ঘুমোলে নাকি?' এর মধ্যে জানা গেছে যে ওঁব কর্তা এবং মণিকার কর্তা একই ক্লাবের মেম্বার। কাজেই ক্লাবের ইলেকশন, আসন্ন মে কুইন বল এবং শেষে নানারকম লীকারের রেসিপীর প্রসঙ্গে আলোচনা বেশ সরস হয়ে উঠল। ঘরে তৈরী পানীয়ের নির্ভেজাল প্রণালী লিখে নিতে মণিকা আর তার বান্ধবী বিভা কাগজকলম বের করে বসল। ইরাদি আ াশবাণীর রান্না শেখানোর ধরনে বলতে লাগলেন, প্রথমে ভালজাতেব আঙুর চটকে পরিষ্কার বোতলে পঁচিশ দিন রেখে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে কাঠের হাতা দিয়ে। তারপর ভাল ফিল্টার পেপারে—না পাওয়া গেলে দু'পুরু মলমল কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। তারপর ডিম ভেঙে তার সাদাটা আলাদা করে ফেটিয়ে নিয়ে ঐ আঙুরের রসে মিশিয়ে খালি শ্যাম্পেনের বোতলে আরো পঁচিশ দিন নাড়াচড়া না করে স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। তারপরে আবার ছেঁকে খেলে তার যে কী সোয়াদ—উম্-ম্-ম্।

দরজার কাছ থেকে সুবলবাবু হেঁকে উঠলেন, 'বন্ধ করুন, এক্ষুণি এ আলোচনা বন্ধ করুন। হরিদ্বারে এসব একেবারে নিষিদ্ধ।'

'তা তো জানি। তাই দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছি। এ ক' দিন যে এখানে কিভাবে সময় কাটবে জানি না।' তারপর একটু ভেবে, 'চলুন না আজ বিকেলে সবাই মিলে সিনেমা দেখে আসি।'

হরিদ্বারে এসে সিনেমা! কুম্ভমেলা দেখতে এসে তিনঘণ্টা রূপোলীপর্দার মুখোমুখি বসে থাকা! সভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে আসি। ছোটঘরের বাসিন্দারা এতক্ষণে দিবানিদ্রা সেরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছেন। কলকাতার তুলনায় এখানে সূর্য ডোবে অনেক দেরিতে। ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গা-আরতির আর বেশী দেরি নেই। কিন্তু পশ্চিম আকাশে এখনো রোদের আভা বেশ স্পষ্ট। সেদিকে তাকিয়ে ওঁদের আর একটু দেরি করে বেরোবার ইচ্ছে ছিল। আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলেন। আমি ভয় পাচ্ছিলাম শেষ পর্যন্ত না ইরাদির সিনেমার দলে যোগ দিতে হয়! মধ্যবিত্ত মানসিকতার অসহনীয় অসদ্‌গুণ-গুলির অন্যতম হ'ল চক্ষুলজ্জা নামে অমোঘ দুর্বলতাটি। আমার মতে মনুষ্যচরিত্রের আত্মসংহারক ষড়রিপুর সঙ্গে এটির নামও যুক্ত করে দেওয়া উচিত। সবকিছু জেনে বুঝেও এই যে আমি ও বস্তুটি বিসর্জন না দিতে পেরে বরং পালিয়ে এসেছি, এজন্য নিজের মনেই গ্লানি জাগছে! তবু তো তাকে ধুয়ে মুছে মন থেকে একেবারে সাফ করা সম্ভব হ'ল না।

শাস্ত্রটস্ত্র সবকিছুই যুগের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তো বদলাবেই। এই যে আজ স্পেশালের কল্যাণে বিলাসিনীরা নিছক প্লেজার ট্রিপ হিসেবে কুম্ভমেলায় চলে আসছেন—একে ঠিকমতো বিচার করতে হলে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্যাগ করতে হবে। গরদের বিকল্প হিসেবে ঠাকুরঘরের শুদ্ধবস্ত্রের তালিকায় সিন্‌থেটিক শাড়ী অনেকদিন ঢুকে পড়েছে। প্রদীপের বদলে টুনিবাল্বের আলপনায় আজকাল আমরা

দীপাবলী সাজাই। সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে ঝটপট ডুব দিয়ে উঠেই মণিকা, ইরাদি, মিসেস ঘোষরা যখন বিউটিকেসের ডালা খুলে চোখ, ঠোঁটের প্রসাধন সেরে নিচ্ছিলেন, বাণীদি তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে সূর্যার্ঘ্য দিচ্ছিলেন। তিনি উঠে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মিসেস ঘোষ প্রসাধন শেষ করে করগুণে জপও সেরে নিলেন দেখলাম। আজকাল গুরুদেবরাও অনেক স্পোর্টিং হয়ে গেছেন। দেহচর্চা, রূপচর্চা এবং সংসারের অন্য ন্য চর্চা এমনকি দ্বিপ্রাহরিক কিটি পার্টি পর্যন্ত সবকিছু বজায় রেখেই এখন তাঁদের নির্দেশিত সাধনপদ্ধতি বেশ পালন করা যায়। আমার এক ধর্মবাতিকগ্রস্থ আত্মীয় নানা সাধুসন্তের জীবনী পাঠ করে সদ্গুরুর চরণে ইহ-পরলোকের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করে সর্বার্থে শিষ্য হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। জনৈক প্রথিতনামা বাবার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সময় সারি দিয়ে বসা তিনশো শিষ্যের উদ্দেশে মাইকে মন্ত্র এবং উপদেশ প্রদানের কমিউনিটি ব্যবস্থা দেখে তিনি গুরুবাদের ভীষণ বিরোধী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, এ-ও বা মন্দ কি। আগের দিনের মতো কঠিন বিধিনিষেধ, আর তা পালন করতে না পারলে কঠিনতর শাস্তি—একালের শিষ্যরা সহ্য করতে পারতেন কি। উপরন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হত। অনেক সাধু-পুরুষের জীবনীতে পড়েছি অজানিতেও গুরুবাক্য লঙ্ঘিত হওয়ায় স্বপ্নযোগে গুরু এসে 'চমটাদ্বারা গুরুতর প্রহার করে গেছেন। একালে আর লাঠৌষধিতে কাজ না হলে একেবারে হাল না ছেড়ে বরং খেলাচ্ছলে ভুলিয়ে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া যায় ততটুকুই লাভ। আধুনিক মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতিতে তো সে কথাই বলে। বাণীদির মতো একগুঁয়ে মানুষদের অবশ্য একথা বোঝানো মুশকিল। আরও মুশকিল হচ্ছে এই, শুনে এসেছি এখানকার হলে এখন 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' দেখানো হচ্ছে। নাম শুনে যদি বাণীদি ইরাদিদের দলে জুটে যান, তাহলে তারপরের অবস্থাটা বোধহয় না ভাবাই ভালো।

চার

হরিদ্বারের শোভা সবচেয়ে খোলে সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গা-আরতির সময়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনজন পুরোহিত যখন তিনখানি একশো আট প্রদীপের বিরাট দীপদণ্ড দুহাতে তুলে ধরে আরতি করেন, সে সময় ঘাটের চারপাশে অন্যান্য মন্দিরগুলিতেও একযোগে আরতি হতে থাকে। কাঁসর-করতালের শব্দে, মাইকের মৃদু গুঞ্জনে সুর মিলিয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে স্তব গাইতে থাকে অসংখ্য নরনারী। নদীর বুকে ঘন হয়ে আসা তারাভরা আকাশের ছায়ায় ভেসে যেতে থাকে ফুলের ডালিতে সাজানো ঘৃতপ্রদীপের কমনীয় জ্যোতি। তখন যে কি আশ্চর্য অপার্থিব অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে যায় সমগ্র পরিমণ্ডল। হরিদ্বারের অনেকখানি চার্ম ভরে আছে ঐ সন্ধ্যার আরতির লগ্নে। হরিদ্বারে থাকলে সন্ধ্যাবেলায় আরতিতে আমার আসা চাই ই। সত্যি কথা বলতে গেলে ঐ আরতির আকর্ষণেই বার বার হরিদ্বারে ছুটে ছুটে আসি। এ শুধু আমার নিজের কথা নয়, এমনি নেশা ধরে গেছে দেখছি আরো কতজনের সন্ধ্যার আগে থেকেই এজন্য হর-কী প্যারীর চত্বরে জায়গা দখলের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবারে পথে ঘাটেই যেরকম ভিড়ের তীব্রতা দেখছি, সন্ধ্যাবেলা হর-কী-প্যারীতে বসতে পাবার দুরাশা মোটেই করিনি। ভেবেছিলাম কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে হয়তো দেখতে পাবো হর-কী-প্যারীর দুটো ব্রিজের সমান্তরাল তিনখানি নতুন ব্রীজ তৈরী হয়েছে এবারে। ভারত সেবাশ্রমের ঘাটের আগের ব্রীজটার কাছাকাছি আসতেই দেখি জনস্রোত ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠছে। কোনো রকমে ঠেলেঠুলে গঙ্গার ধার ধরে এগিয়ে চলেছি। ভাবছি ঘাটের আশেপাশে হয়তো একটু দাঁড়িয়ে দেখা যাবে। হর-কী-প্যারীর আগের ব্রীজটার মুখে এসে একটা ভয়ানক রকম ধ্বস্তাধ্বস্তি, ধাক্কাধাক্কির

আবর্তে পড়ে গেলাম। এই ব্রীজ দিয়ে সমস্ত জনস্রোতকে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখান থেকে আরেক ব্রীজ দিয়ে হর-কী-প্যারীতে আসতে হবে। সোজা রাস্তা দিয়ে গঙ্গামন্দিরের দিকে এগোতেই দেওয়া হচ্ছে না। অবশ্য যেতে দিলেই যে যাওয়া যেত তা নয় চেষ্টা করলে বরং বৃথা খানিকটা গুঁতোগুঁতিই সার হত। ব্রীজের ওপরে উঠে পরে দেখেছি যে সেদিকে ভিড় এমন নিশ্ছিদ্র যে মাছিটি গলবারও ফাঁক নেই। সে যাক, এখন এই ব্রীজ দিয়ে যাওয়া আসা করতে করতেই তো আরতি শেষ হয়ে যাবে। মাইকে আরতির গান এখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে—

ওঁ জয় জগদীশ হরে, স্বামী জয় জগদীশ হরে
ভক্তজনোঁকে সংকট ক্ষণ মে দূর করে।
যো ধ্যায়ে ফল পায়ে দুখ মিটায়ে মনকা
সুখ-সম্পত্তি ঘর আবে কষ্ট মিটে তনকা॥
মাতা-পিতা তুম মেরে শরণ পড়ু মৈঁ কিস্‌কী।
তুম্ বিন অওর ন দুজা আশ করুঁ মৈঁ কিস্‌কী॥
তুম্ পূরণ পরমাত্মা তুম্ অন্তর্যামী।
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তুম্ সবকে স্বামী॥

গানের হাতছানিতে দড়ির নিষেধ না মেনে অনেকেই সোজা রাস্তায় ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে এগোতে চেষ্টা করছে। মৃদু লাঠি চালনা করে পুলিশ তাদের ব্রীজের ওপরে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এই ধাক্কাধাক্কি। এরমধ্যে পেছনেও লোকের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই ওই ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই সামনে এগিয়ে যেতে হল। ব্রীজে ওঠার ঠিক আগে রাস্তাটা আবার সরু হয়ে গেছে। ভিড়ের চাপে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। নিজের হাতদুটোও চাপের ভেতর থেকে ইচ্ছেমতন বের করে আনব তার উপায় নেই। সামনের, পেছনের লোকের গায়ে সেঁটে গিয়ে তাদেরই ধাক্কায় চলতে হচ্ছে। সমতল জায়গায় এভাবে ভিড়ের মধ্যে গা এলিয়ে বিনা আয়াসে বেশ এগিয়ে যাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে ব্রীজে ওঠার সিঁড়িতে বেশ কয়েকবার ঠোকর খেতে হল। কারণ নীচু হয়ে পায়ের নীচের পথ দেখার উপায় নেই। কোনোরকমে অন্ধভাবে সিঁড়িগুলি টপকে ওপরে উঠতে পারলে ব্রীজের ওপরে আবার ভিড় একটু হাল্কা। অরুণদার বাটিকের পাঞ্জাবির কাঁধের কাছটা দেখি ঠেলাঠেলিতে বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ক্যামেরাটা এতক্ষণ উনি একহাতে নিশানের মতো উঁচু করে ধরেছিলেন। আর একহাতে আরতিদির হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। বড়ো সুন্দর লাগে ওঁদের পরস্পরের নির্ভরতার এই ছবিটি। বয়সের পরিণতি একধরনের প্রসন্ন সৌন্দর্য আনে যৌবনের রূপের চেয়েও যা অনেক বেশী সুন্দর। টানটান চামড়ার চেয়েও পরিতৃপ্তির কোমল রেখা মনকে অনেক বেশী টানে। যৌবনের সচেতন তীক্ষ্ণতার আকর্ষণের সঙ্গে এক হয়ে থাকে অন্তর্লীন নিষেধের বিকর্ষণ। এই দম্পতির সহৃদয়তার লাবণ্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছবি দেখে আমার মনে হয় যে ওঁদের সঙ্গে কম বয়সে দেখা হলে বোধহয় এত ভালো লাগত না। সত্যিকারের সৌন্দর্য তো বয়স বা গঠনের ওপর নির্ভর করে না, তার বাসা সংগতিবোধে। যৌবনের আকাঙ্ক্ষার ছবি যদি প্রৌঢ়ত্বের পরিণতিতে না স্নিগ্ধ হয়ে আসে, সে আবার বড়ো কুশ্রী। জ্বলজ্বলে লালসার আলোয় বলিরেখাগুলিকে তখন আরো বেশী ক্ষুধার্ত মনে হয়। জীবন মানুষকে অনেক সময় অনেক বঞ্চনা করে সত্যি কিন্তু তার কাছে হার না মানলেই তো উল্টে তারই হার হয়। আর সেই হারানোর অনুজ্জ্বল তৃপ্তি যে কত সুন্দর! চারপাশের অনেক অন্ধকারকে আলোয় ভরে দেওয়ার মোহময় শক্তি তার ভিতরে।

চলতে চলতে বাঁদিকে চেয়ে দেখি ব্রহ্মকুণ্ডে আরতি শুরু হয়ে গেছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে যাবার উপক্রম দেখেই লাঠিহাতে পুলিশ এসে প্রশ্ন করে, 'দাঁড়াচ্ছ কেন, পথ বন্ধ কোরো না, এগিয়ে যাও।' সকলে মিলে দাঁড়িয়ে পড়লে চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় ঠিকই। তবু অনেকের মধ্যে একটু কোণ ঘেঁষে লুকিয়ে চুরিয়ে দু-একজন তো

দাঁড়াবেই। আর সেই আইনভঙ্গকারীদের দলে ঢুকে যাই আমিও। মনে আছে সুদীর্ঘ লাইনে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর তিরুপতি মন্দিরে বিগ্রহের কাছাকাছি হতেই—তখনো দেবতাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতেও পাইনি, পূজারীরা তাড়া দিতে লাগলেন লাইনের নিরবচ্ছিন্নতা ঠিক রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে। আমি নির্বিকার মুখে শুনেও বুঝিনি ভাব করে চলমান লাইনের স্রোত থেকে বেরিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবাইকে সমানভাবে দর্শনের সুযোগ দেওয়া নীতিগতভাবে কর্তব্য ঠিকই। কিন্তু সেজন্য যদি নিজের দর্শনটা একেবারেই ফাঁক যায় তাহলে একটুখানি স্বার্থপরতাকে ঠিক অন্যায় বলে মানা যায় না। বরং সেটাই মানবিক। এজন্যই দক্ষিণীমন্দিরের জবরদস্ত পুরোহিতরাও এটুকু বেনিয়ম দেখেও না দেখার ভানে মেনে নিয়েছিলেন। আর এখানকার পুলিশ তো এতজনের গতিবিধি নিয়ে এতই ব্যস্ত। সে একটু অন্যদিকে এগোতেই আমি এধার ওধার করে চলমান জনস্রোতের আড়ালে রেলিং ধরে একটা সুবিধে মতন পজিশনে দাঁড়িয়ে গেলাম। এবারে আরতিদিরা আমার পেছনে। সামনে কালো জলের ছলছল বয়ে যাবার মৃদু শব্দ। দূর থেকে আলোকোজ্জ্বল ব্রহ্মকুণ্ডে অবয়বহীন ভিড়ের বিস্তৃত পটভূমিতে জ্বলজ্বল্ করে উঠেছে তিনটি বিশাল দীপদণ্ডের আলোক-সমারোহ। দীপগুলি আলাদা করে বোঝা যায় না। যেন তিনটি প্রজ্বলিত মশাল তালে তালে দুলিয়ে আকাশের জ্যোতিরুৎসবের অধিদেবতাকে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। কালো জলে অসংখ্য তারার ছায়ার মতো ভেসে যাচ্ছে অগণ্য প্রদীপ। ভজনের দূরাগত ধ্বনি মৃদু হয়ে, বড়ো মধুর হয়ে কানে বাজতে থাকে—

'তুম করুণা কে সাগর তুম পালন কর্তা
মৈঁ সেবক তুম স্বামী কৃপা করো ভর্তা
তুম হো এক অগোচর সবকে প্রাণপতি।

কিস্‌বিধি মিলুঁ গোসাঁই তুমকো মৈঁ কুমতি
ওঁ জয় জগদীশ হরে ॥'

সব মিলিয়ে সে যেন এক অবাস্তব স্বপ্নদৃশ্যের মধ্যে ডুবে ছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডের ভিড়ের ভিতরে বসলে এরকম মনে হত না। ইন্দ্রিয়ের বোধে দূরত্ব একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়। তন্ময় হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম—কখন যে গান থেমে গেছে, পাশ দিয়ে ভিড়ের প্রবাহ নেমে চলে গেছে বুঝিনি। অরুণদা যখন ডাক দিলেন তখন জলের কলকল শব্দ আরো জোরে বাজছে। ব্রীজ থেকে আবার এপারেই ফিরে এসে নিরালা ঘাটের শেষ ধাপে নেমে বসলাম। ওপারে একটু দূরে ঘাটের পাশে খানিকটা চত্বর আলোয় আলোময়। সুবেশা নর্তকীরা যেন এক পরীর দেশের দৃশ্য খুলে দিয়েছে। নাচের পর একটা অভিনয়ের ব্যাপার শুরু হল। এতদূর থেকে কথা কিছু বোঝা যায় না—চোখ-মুখ-মুদ্রাও স্পষ্ট নয়। আন্দাজে মনে হল যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ এবং সখীপরিবৃতা শ্রীরাধিকার কোনো কাহিনী অভিনীত হচ্ছে। দূর থেকে দেখতে ভারী চমৎকার লাগছিল। দূর থেকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে না তাকে ইচ্ছেমতন কল্পনা করে নিতে কোনো বাধা নেই। 'আপনারা এখানে বসে আছেন। ওই ঘাটে কি সুন্দর মণিপুরী রাস নৃত্য হচ্ছে।' তাকিয়ে দেখি ওপার থেকে ব্রীজ পেরিয়ে আসছেন রবিদা। 'রাস নৃত্য আবার কারা করছে?' 'সব গভর্মেন্টের ব্যাপার মশাই। সন্ধেবেলা একেকদিন এক একটা রাজ্যের লোকরঞ্জন শাখার উৎসব চলছে ওখানে।' এতো ভারা সুন্দর ব্যবস্থা। সরকারী প্রশাসন যে জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জনরঞ্জনের কথাটাও ভেবেছেন তা দেখে ভালো লাগল। এই মেলার ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে সংগতি রেখে যদি এরকম অনুষ্ঠান রোজ সন্ধ্যাবেলা করা হয়, পথে ঘাটে ছিটিয়ে থাকা, উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ান অসংখ্য মানুষের জন্য সে হবে বড় চমৎকার উপহার। তাত্ত্বিক বিচার, শাস্ত্রপাঠ কজন শুনতে চান, কজনই বা

বুঝতে পারেন। কিন্তু যাত্রাপালা ভজনকীর্তন, কথকতার মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের তথা জনসংযোগের যে ধারাটি আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে সেটিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে আজকের দিনেও তার আকর্ষণী শক্তি একটুও কমেনি। ওপারে গিয়ে আরো কাছের থেকে দেখতে ইচ্ছে জাগে। ব্রীজের ওপর দিয়ে আবার ওপারে যাই। কিন্তু আমরা আসতে আসতেই এ অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। পিছনে টাঙানো মণিপুর রাজ্যের মানচিত্র আঁকা কমলা রঙের কাপড়টা খুলে পতাকার মতো ধরে নিয়ে চলল শেষ দুজন অভিনেতা। চারদিকের জমে থাকা লোকজনরাও উঠে রওনা হল। শূন্য ঘাটের রানায় এসে আমরাই আবার বসে পড়ি। এপার থেকে নদীর ওপারের দৃশ্য বড় সুন্দর। সব মঠ-মন্দির-আশ্রম বিজলী আলোর সাজে ঝলমল করছে। একেবারে কলকাতার দেওয়ালীর দৃশ্য। হরিদ্বারকে এত আলোকোজ্জ্বল কখনো দেখিনি। সামনে মনসাপাহাড়ের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ আলোর গোড়ে মালার লহর দোলানো। ওদিকে চণ্ডীমন্দিরের আলো যেন অন্ধকারের জমাট পাহাড়ের চূড়ায় ফুটে ওঠা জ্যোতির কুসুম তোড়া করে সাজানো। এই সব মানুষী উৎসবের মাথার ওপরে অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে জ্বলছে অনন্ত দীপাবলী। সামনে অবিরাম বয়ে যাচ্ছে উদাসীন গঙ্গার কালো জল। একটানা প্রবাহের শান্তি স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত করে, আচ্ছন্ন করে আনে।

চুপচাপ বসে বসে রাধার কথাই মনে পড়ছিল। আমাদেরই পড়শী সাধারণ ঘরের মেয়ে। পড়াশোনায় বিশেষ ভালো ছিল না। স্কুলের গণ্ডী কোনো রকমে পেরিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য ভালো ছিল দেখতে। রজনীগন্ধার গুচ্ছের মতো অমলিন রূপ আর তেমনি সুকুমার, সুগন্ধি নরম একটি মন। সংসারে যে মন্দ কিছু আছে ওকে দেখলে তা ভুলে যেতে হত। নিবিড় কালো পাতার আড়ালে টানা টানা দুচোখের তারায় ঝিকিমিকি আলো

ছড়িয়ে যখন এলাহাবাদে শ্বশুরঘর করতে গেলো, দেখে বড় ভালো লেগেছিল। প্রবালদের পরিবার দীর্ঘদিন ওখানে প্রবাসী। ধনে-মানে বাঙালীসমাজের মাথা। প্রবালের বাবা কলকাতায় এক বিয়ে বাড়িতে এসে রাধাকে প্রথম দেখেন। মেয়ের রূপ আর স্বভাব দেখে তড়িঘড়ি বৌ পছন্দ করে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু বাড়ির অন্যদের পছন্দ হল না রাধাকে। শাশুড়ী রুষ্ট হয়েছিলেন তত্ত্বের পরিমাণ দেখে। বড় ননদ আই. এ. এস। ছোটো ডাক্তারী পড়ছে। ইংরেজীর অধ্যাপিকা বড় বৌদির সঙ্গে তুলনায় রাধাকে তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করেনি। আর প্রবাল তো বড়লোকের ছোটছেলে। নিজের মাথা খাটানোর চেয়ে অন্যদের মতে সায় দিতেই অভ্যস্ত। এক বছরের মাথায় বাবা মারা যাওয়ার পর রাধাকে কল-কাতায় পৌঁছে দিয়ে তারপর তার কথা তারা কেন জানি একেবারে ভুলেই গেল। আজ কাল করে তারপর দুবছর গড়িয়ে গেছে। রাধাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসে। বলে, 'কেন মিতুদি, মানুষ তো তারা খারাপ না। পুড়িয়ে না মেরে কেমন ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।'

রাধাকে যারা জানে, তারা জানে যে রাধার মুখে এই কথাটাই কত কঠিন। কত গভীর অশ্রুর প্রবাহ ভাসিয়ে রেখেছে এই পরিহাসের রক্তকুসুম। প্রবালের প্রসঙ্গে একদিন শুধু বলেছিল, 'ওর দোষ কি বলো। আমি যে ওর যোগ্য নই।' এ কথার মানে আমি বুঝিনি। এমনি চুপ করে না থেকে ও যদি হাউহাউ করে কাঁদতো, সশব্দে ধিক্কার দিত ভাগ্যকে, মেলে ধরতো বড় বাড়ির বড় দোষের পশরা তাহলে হয়তো শুধু আমরা নই, ওর নিজেরও বুকটা হাল্কা হত। স্বস্তি পেতো। কিন্তু মুখ লুকিয়ে থাকাই রাধার অভ্যাস। তাকিয়ে দেখি তার দুচোখের দৃষ্টিতে শুধু ঘনিয়ে থাকে দুরপনেয় ছায়া। নীরবতার কঠিন ভারে ক্রমশঃ রক্তহীন হয়ে উঠছে তার ব্যক্তিত্ব। মধ্যবিত্তঘরের স্বল্প শিক্ষিত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসা মানে দেহমনের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে সুতীক্ষ্ণ

কণ্টকশয্যাকে আলিঙ্গন করা। কয়লা পোড়ালে দেখা যায় দাহিকাশক্তির নতুন লীলা। কিন্তু শিরীষ ফুলে আগুন দিলে! রাধার আঁচ লাগা মুখের ছবিতে সেই নিঃশব্দ নিষ্ঠুর দহন দেখে চারপাশে আমরাও জ্বলে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে প্রবাল এসে ওকে নিয়ে গেল। ভালো হল বড় ভালো হল। কুম্ভে আসার নামে এই সুলক্ষণ যেন শান্তি-জলের মতো ভিজিয়ে দিল মনকে।

'এই মিতু, কি এত ভাবছো তখন থেকে?' অরুণদার ডাকে চমকে দেখি সকলে আমার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জা পেয়ে হাসি। উল্টো কথা বলছেন অরুণদা। ভাবনা আবার কেউ ভাবে নাকি! ভাবনাই তো মানুষকে ভাবায়।

যাবার সময় রাধাকে বলেছিলাম, 'পুরনো কথা কিছু মনে রাখিস না রাধা কখনো প্রবালের দোষ দিস না।' জানি রাধা তা কখনো করবে না। বরং করতে যে পারে, আমার মুখে একথা শুনেই অবাক হল। কিন্তু প্রবাল, সে কী পারবে ভুলে যেতে? মুছে ফেলতে পারবে এই ছবছরের বিচ্ছেদের কালো রেখাটা! অপরাধী নিজের লজ্জা ঢাকতেই উল্টে কাঠিন্যের বর্ম পরে নেয় জানি। গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়ায় হঠাৎ কেমন ভেতর থেকে কাঁটা দিয়ে কেমন শীত করে উঠলো। রাত বোধহয় অনেক হয়ে গেছে।

বাসায় ফিরে দেখি ইরাদিরা কেউ ফেরেননি। হাত-পা ধুয়ে আরেক রাউণ্ড চায়ের পর আরতিদি বললেন, 'চলো ছাদের থেকে ঘুরে আসি।' মাঝখানে মস্ত উঠোন ছেড়ে চারদিক ঘিরে পুরোনো দিনের ঢঙে তৈরী বাড়ি। মস্ত ছাদ চারদিকে ভাগ হয়ে যেন চারটে ছাদ। আজ অমাবস্যার স্নান উপলক্ষে হরিদ্বারে এসে পৌঁছেছেন অজস্র মানুষ। এসেই ঘাটে স্নান সেরেছেন। তারপর সঙ্গে আনা পুরী, আচার আর লাড্ডু খেয়ে যত্রতত্র বিছানা বিছিয়ে গড়িয়ে দিয়েছেন দেহটাকে। কাল ভোরেই আবার রওনা হয়ে যাবেন। ছাদে উঠে দেখি এইরকম একদিনের অতিথিরা অনেকেই বিছানা

কম্বল বিছিয়ে সারিসারি শুয়ে পড়েছেন ছাদে। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে আছেন অনেক মহিলাও। কয়েক মাসের শিশুকোলেও আছেন দু-চারজন। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে এখন সব পান্থশালা-ধর্মশালাতেই স্থানাভাব। আমাদের এই দুটি ঘরের জন্য দশদিনে ভাড়া দিতে হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এছাড়াও এই স্পেশালের আরো প্রায় সত্তর জন যাত্রী আছেন। তাঁরা আছেন দুটি হোটেলে ভাগ হয়ে। সেই হোটেলগুলিতেও অবশ্য ঘরের নির্দিষ্ট খাট ইত্যাদি আসবাবপত্র তুলে ফেলে সারি সারি ঢালা বিছানা করা হয়েছে। আর একটি হোটেলের বিরাট ব্যালকনি ঘিরে নিয়ে হয়েছে সকলের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। তবে মোটা খাবারটা হোটেল থেকে এলেও লুচি ইত্যাদি গরম ভেজে দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আছে শ্রীমান-দ্বয় গৌরহরি এবং নারায়ণ। দুবেলার চা-জলখাবারের ব্যবস্থাও এখানে। ছাদ থেকে দেখছি বারান্দার কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে আমাদের নৈশ আহারের প্রস্তুতি চলছে। অন্য বাসাড়েরা কিন্তু বেশীর ভাগই নিদ্রামগ্ন। অতি প্রত্যূষে উঠে গঙ্গাস্নান সেরে দিনশুরু এবং সন্ধ্যাবেলা আরতির সঙ্গে সঙ্গেই দিনের কাজ সেরে বিশ্রাম হরিদ্বারের প্রচলিত রীতি। তীর্থযাত্রীরাও এই রীতি মেনে চলেন। আমরা যেন এখানে এসে কেমন না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে রয়েছি। না পারছি ওই খোলা আকাশের তলে নিশ্চিন্ত শান্তির আরামে চোখ বুজতে, আবার চোখ খুলে থাকলেও কেমন যেন নিজেকে চারপাশের সঙ্গে বেমানান লাগে। ছাদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাই। ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে উজ্জ্বল আলোর প্রতি-ফলনে আকাশটাও দ্যুতিময় হয়ে রয়েছে। বাকী সবদিকে গাঢ় নীলাম্বরীতে ঝকঝকে তারার জামদানী নকশা। কলকাতার আকাশে তারাদের যেন কেমন নিষ্প্রভ লাগে। হয়তো খানিকটা শহরের ধুলো-ধোঁয়ার জন্য, খানিকটা আবহাওয়ার জন্য আর বেশ খানিকটা ইলেকট্রিক আলোর প্রতিফলনে। মনে আছে অমরনাথের পথে

শেষনাগের তীরে দেখা তারাভরা আকাশের কথা। সন্ধ্যার মুখে মুখে খানিকটা ঝড়বৃষ্টি হয়ে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। তখনো চাঁদ ওঠেনি। সন্ধ্যার আবছা আকাশে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল তারার সারি। আকাশের রঙ হালকা নীল থেকে গাঢ় হতে হতে পৌঁছে গেল ঘন কালোয়। আর সেই সঙ্গে আরো বেশী দীপ্ত হয়ে উঠলো রূপালী বিন্দুগুলি। যেন উর্বশীর আঁচলের পাল্লায় দ্যুতি-বিচ্ছুরিত সলমা-চুমকীর সমারোহ। আকাশের রূপও যে স্থানভেদে এত বদলে যায়, তারার আলোতেও যে এত দীপ্তি থাকে এ অভিজ্ঞতা আমার সেই প্রথম। চারদিকের তুষারশৃঙ্গের শ্বেতপটভূমিকায় প্রতিফলিত হয়ে সেই আলো যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার চেয়েও বেশী দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। পর্বতারোহী বন্ধুর কাছে শুনেছি এভারেস্টের বেস্ ক্যাম্পের তাঁবু থেকে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে দেখেন চাঁদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সূর্যের মতো চোখ ঝলসানো প্রখর দীপ্তি এসেছে চন্দ্রকিরণে। সে দুর্লভ দৃশ্য আমার ক্ষুদ্র কল্পনাতে আনতে পারি না। কিন্তু শেষনাগের সেই তারার কিরণের ছবি মনশ্চক্ষে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কলকাতায় রাতের আকাশে এমনি স্থির হয়ে দেখার ফুরসৎ কমই হয়। তাছাড়া চারদিকের বহুতল অট্টালিকা, কারখানার ধূমনিঃসারী চিমনিতে কলঙ্কিত আকাশরেখার এই উন্মুক্ত ব্যাপ্তিও তো নেই। এখান থেকে দূরে দেখছি মনসাপাহাড়ের আলো। আর আরো অনেক দূরে চণ্ডীপাহাড়ের আলোকবিন্দু যেন একটি নিকট-বর্তী নক্ষত্রের মতো মনে হয়। এছাড়া ছড়ানো আকাশে দৃষ্টি আর কোথাও বাধা পায় না। অবারিত সমুদ্রের চেয়েও আকাশের এই বিস্তার অনেক বেশী নিবিড়। তাতে অবিরত তরঙ্গভঙ্গের বিক্ষেপ নেই।

আরতিদি এবার কাঁধটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেন 'কি হয়েছে তোমার? এতবার ডাকছি শুনতে পাচ্ছো না? কি এত ভাবছো বিকেল থেকে?'

সত্যি খুব অসভ্যতা হয়ে গেছে। আরতিদিকে কি করে বলি ওঁর সঙ্গে ছাদ দেখতে এসেই আমি আসলে চলে গিয়েছিলাম রাধার কাছে। কলকাতার ছাদে আকাশের দিকে চেয়ে রাধা কুম্ভমেলায় আসতে চেয়েছিল। শুনেছি এলাহাবাদে গঙ্গার ওপরেই ওদের বাড়ি। ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হয়তো রাধাও এখন কিছু ভাবছে। রাতের আকাশ যেন নদীর মতো নিবিড় স্রোতে বয়ে যায়। অসংখ্য আশার প্রদীপ ভাসানোর প্রতীক সেই নদী। তার মধ্যে ডুব দিয়ে কত সহজে ছুঁতে পারি কত দূরকে। অনেক সন্ধ্যায় রাধা আমাদের ছাদে উঠে এসেছে অন্ধকারে ধুয়ে নিতে, ঢেকে নিতে নিজের মনকে। কুম্ভমেলায় আসার বড় লোভ ছিল রাধার। আজকের সন্ধ্যায় তাকে কিছুতেই কেন মন থেকে সরাতে পারছি না।

পাঁচ

আজ দশ তারিখ। ন' তারিখে পৌঁছেই নির্বিঘ্নে মৌনী অমাবস্যার পুণ্যস্নান করা হয়েছে সকলের। এরপরে কুম্ভযোগের মুখ্য স্নান আছে চোদ্দ তারিখে। বাংলা মতে বললে তেরো তারিখে রাত ছটোর পর। মাঝের এই কটা দিন তাই নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য নেই। মণিকারা লুচি তরকারীর ব্রেকফাস্ট সেরে একটা দলে বাজারে বেরিয়ে গেল। ইরাদির এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ। কলকাতার নিউমার্কেট, দিল্লীর কনটসার্কাসের সঙ্গে তুলনায় হরিদ্বারের বিশিষ্টতার সম্বন্ধে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন জানিয়ে দিলেন। ভাগ্যিস ভদ্রমহিলার পরিধিটা ভারতবর্ষের বাইরে যায়নি। নয়ত এই তালে প্যারিস কিংবা মন্টিকার্লোর সঙ্গে তুলনায় হরিদ্বাকে নস্যাৎ করে দিলেও আমাদের কিছু করার থাকত না, শুধু নিঃশব্দ বিবেকের

ভূমিকায় অস্বস্তিভরে চুপ করে থাকা ছাড়া। আগরতলার মাসীমা-মেসোমশাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন প্রায় একমাস আগে। এই স্পেশালেরই আর একটা ট্রিপে গুজরাট-রাজস্থান বেড়িয়ে কাল সকালে হরিদ্বারে এসে আমাদের সঙ্গে মিলেছেন। রাজস্থান থেকে পাল্লা দিয়ে রকমারী সওদা করে এনেছেন দুজনে। মেসোমশাই বৌদের শাড়ী তো মাসীমা নাতিদের কুর্তা। বারবার খুলছেন, দেখছেন, দেখাচ্ছেন আর দু'জনে খুনসুটি করছেন। মেসোমশাই একফাঁকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'বুঝছনি, গিন্নীর নিজের কাপড়খান দেখাই নাই বইলাই এত রাগ।' অবাক হয়ে বলি, 'তা দেখাননিই বা কেন? সকলের জন্যই কিনেছেন যখন, সত্যি তাহলে রাগ তো ওঁর হতেই পারে।' এবারে মেসোমশাই মিটিমিটি হাসেন, 'আরে সেইটাই তো মজা। বাড়ি গিয়া নাতির খেলনার লগে একেবারে হাতে দিমু।'

নাঃ, মেসোমশাইর ওপর রাগ করার খুবই সঙ্গত কারণ আছে। বুড়োবয়সে ছেলে-বৌ-নাতিদের সামনে এমনি লজ্জায় ফেললে সে মানুষের সঙ্গে ঘর করা বড় ঝকমারি। আরতিদি হেসে বলেন, 'দেখেছ, কেমন ভাব। সিলভার জুবিলীর হানিমুন করতে বেরিয়েছেন দুজনে।'

'আপনারাও তো তাই। যেরকম জোড়ের পায়রা হয়ে ঘুরে বেড়ান, দেখে আমার রীতিমতো হিংসা হয়।'

'খবরদার হিংসে করবে না। নিজেরাও তো জোড়ে ঘুরে বেড়ালেই পারো। তা নয়,খালি বড়দের পেছনে লাগা।' আরতিদি হাসতে হাসতে অরুণদাদের ঘরে চলে যান। এ ঘর এখন প্রায় খালি। বাজারের ট্রিপে সকলে দল বেঁধে চলে গেছেন। শুধু বাণীদি এরমধ্যে নেই। এতক্ষণে নিত্যক্রিয়া ধ্যান-জপ সেরে কাপড়-চোপড় বগলদাবা করে তিনি গঙ্গাস্নানে বেরোলেন। আজ আর ব্রহ্মকুণ্ডে যাবেন না। ভোলাগিরির ঘাটেই স্নান সেরে মনসামন্দিরে পূজা দেবেন।

আমাদের ওঁরা তো বসতে পেলে শুয়ে পড়েন। গদির করাসে সকাল থেকে আড্ডার মৌতাত চলছেই। অরুণদা অকৃপণভাবে ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ বিলি করে মেজাজের গোড়ায় ধোঁয়া যুগিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে বাণীদির সদ্‌-দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ওঁদের ওঠালাম। চান না হয় এখন থাক্, কিন্তু মনসামন্দিরটা তো দেখে আসতে পারি। এরপর যোগের দিন যত এগিয়ে আসবে ভিড় ততই বাড়বে। সুবলবাবুর আজ অভ্যস্ত মর্ণি-ওয়াক্ হয়নি। ফিগারসচেতন মানুষ হাঁটার কথায় সহজেই রাজী হয়ে যান। অরুণদাকে ওঠানোর দায়িত্ব আরতিদির। আর তিনি উঠলে একা আনন্দকে ওঠানো কঠিন নয়।

এইসব তোড়জোর করে বেরোতে বেরোতে রোদ বেশ চড়ে গেল। কাল রাত্রের দিকে দেখেছি ভ'লোরকম ঠাণ্ডা পড়েছিল। আবার রোদ উঠলে বেশ গরম। নদীর ধার হলেও এত শুকনো আবহাওয়া যে একদিনেই গা-হাত-পা শুকিয়ে একেবারে চড়্‌চড়্ করছে। হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে একটা ছোট্ট কালভার্ট পেরিয়ে মনসাপাহাড়ের সামনে আসি। এখন আর ওপরে কষ্ট করে হেঁটে উঠতে হয় না। রোপওয়ে হয়ে গেছে। বিরাট লম্বা লাইন পড়েছে। আমরাও তার শেষে দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে দেখি মণিকারাও এসে লাইনে দাড়িয়ে আছে। ভালই হল সকলে মিলে একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় অপেক্ষাটা গায়ে লাগবে না। তবে রোদ এত কড়া, গরমটা সহ্য করাই মুশকিল। অরুণদা মণিকাকে হেঁকে বলেন, 'একটা গান ধরো।' গানে মণিকার কখনো আপত্তি নেই। জোর গলায় গেয়ে ওঠে 'দারুণ অগ্নিবাণে রে··· ··' 'ঠাকুর দেবতার স্থানে এসে আবার এসব কি গান ধরলে বাপু, তোমাদের কি গানের সময় অসময় নেই?' কণ্ঠস্বরের ঝাঁজে চমকে পিছনে চেয়ে দেখি স্নানসেরে বাণীদি এগিয়ে আসছেন। লাইন এতক্ষণে অনেকটা বেড়ে গেছে। বাণীদিকে পিছনে দাঁড়াতে হবে। তিনি শ্রুতিসীমার বাইরে যেতে আরতিদি স্বামীকে অনুযোগ দেন, 'সত্যি, কি যে তোমার গানের নেশা। এই

বয়সে কোথায় ঠাকুর দেবতার নাম করবে—তা না।' অরুণদা হাসতে থাকেন, 'এই বয়সেই তো গান চাই। জাননা গানই যে সকলের শ্রেষ্ঠ পূজা—

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণঃ লয়ঃ।
লয়কোটিগুণঃ গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

'বুঝিনা বাপু তোমার অং বং। তা শ্লোকটা ভদ্রমহিলার সামনে বললেই তো হত।'

এতক্ষণে বুঝি আরতিদির অনুযোগ আসলে অরুণদার প্রতি নয়, বাণীদিরই উদ্দেশে। পতির প্রতি আঘাত সতীর গায়ে বেজেছে। আমার ঠোঁটে হাসি দেখেই বাণীদি আন্দাজ করেন কি ভাবছি। রুষ্ট মুখে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু বেশীদূর এগোবার উপায় নেই। লাইন বড় আস্তে এগোচ্ছে। যেন বিশালকায় অজগর ভরা পেটে নড়তেই পারছে না। রোদ ক্রমশঃ চড়া হচ্ছে। আশেপাশে একটু ছায়া নেই। শোভনাদি ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জলের বোতলটা এনেছিলেন সঙ্গে। কোথা থেকে যেন অনবরত বোতল ভরে ভরে এনে সবাইকে জল খাওয়াতে লাগলেন। শুধু আমাদের নয়, লাইনের সবাইকেই জল দিলেন। মিষ্টি ঠাণ্ডা জল। হরিদ্বারের এবারে এটাই খুব ভাল লাগছে। একটু দূরে দূরেই নল লাগিয়ে পানীয় জলের কল বসানো হয়েছে। সবসময়ই অজস্র, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার জলের সরবরাহ। এইরকম সুবন্দোবস্ত থাকলে মহামারীর আশঙ্কা মোটেই থাকে না। এইসব ব্যবস্থা দেখে বুঝছি কেন এবারে মেলায় কলেরার টীকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়নি। সত্যিই এবারে তার দরকার ছিল না। কিন্তু কলেরা না হোক, কড়া রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে প্রায় হীটস্ট্রোক হবার যোগাড়। অথচ লাইন তো মোটেই এগোচ্ছে না। শেষে বোঝা গেল যে অনেক বুদ্ধিমান পুণ্যার্থীরা সামনে থেকে যথেচ্ছ লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আমরাও তখন তৎপর হলাম। কালীঘাটমন্দিরের

গর্ভগৃহের ধাক্কাধাক্কিতে অভ্যস্ত আনন্দ সুদক্ষভাবে সামনে একটি গোলমালের ফাঁকে অনুপ্রবেশ করে সকলের টিকিট নিয়ে এলেন। টিকিট হাতে এলে ভেতরে ঢোকার লাইন আবার আলাদা। কয়েক-জন বিপুলায়তনা মাড়বারনন্দিনী সেখানে থানা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা প্রচুর কোলাহল করে—নাকের ঝুমকোদোলানো নথ এবং হাতের একরাশি বেলোয়ারী চুড়ি আন্দোলিত করে বলছেন যে 'আদমীরা' টিকিট আনতে গেছে। আমাদের এই রোদে দাঁড় করিয়ে না রেখে ভেতরে ঢুকে যেতে দাও। দ্বাররক্ষকের বক্তব্য, টিকিট হাতে না থাকলে সে ভিতরে ঢুকতে দেয় কি করে। সে মহিলারা এমন নিপুণ ব্যূহে দরজা ঘিরে দাঁড়িয়েছেন যে অন্য কারও ভিতরে যাবার সাধ্য নেই। এক অসমসাহসী ভদ্রলোক তাদের কথার মাঝে বাধা দিয়ে একটু সরে দাঁড়াতে বলায় বীরাঙ্গনারা এমন গা মোড়ামুড়ি দিলেন যে ভদ্রলোকের প্রায় ছিটকে পড়ে যাবার অবস্থা। কাজেই টিকিট হাতে নিয়েও অনেকে বাধ্য হয়েই পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরাও নীরবে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি টিকিট হাতে বাণীদি আসছেন। চুড়ো করে বাঁধা ভেজা চুলের ওপরে ভিজে গামছা চাপানো। ডানহাতে পূজার উপচার, ফুলের ডালি। জমায়েতের দিকে সন্দিগ্ধ অপ্রসন্নতায় তাকিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলেন। তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে ওঁকে পথ করে দিয়ে ঠিক পিছনে পজিশন নিয়ে নিলাম। যত বড় বীরাঙ্গনাই বিপক্ষে থাকুন, বাণীদি সামনে থাকলে কোন ভয় নেই। কিন্তু সম্মুখ সমরের আর প্রয়োজন হল না। মহিলাদের 'আদমী' এক শুকনো, বেচারী চেহারার বৃদ্ধ টিকিট হাতে এসে গেলেন। দারোয়ানকে ছেড়ে মহিলারা এবার ওঁকে নিয়ে পড়লেন। কিচিমিচি করে কত কি যে বলতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র করলেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে মহিলাদের আগে আগে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরাও ঢুকলাম। এক একটা বগিতে মুখোমুখি চারজনের বসার

ব্যবস্থা। আমি বসেছি নদীর দিকে মুখ করে। একটু ওপরে উঠতেই চোখের সামনে এক আশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্যের বাতায়ন খুলে গেল। সামনে বাড়িঘরের বেড়া পেরিয়ে প্রবাহিত নদী এবং তার ওপারে বিস্তৃত চড়ায় তাঁবুর পরে তাঁবু সাজানো মেলাক্ষেত্রের সমগ্র চেহারাটা সমতলে দাঁড়িয়ে কখনো এভাবে দেখা যেত না। আর সব-কিছু ছাড়িয়ে সবকিছুর ওপরে হরিদ্বারের জাদুকরী পরিপ্রেক্ষিত—পাহাড়ের ওপারে পাহাড়ের সারি। রোদ ঝলমলানো নদীর রং এখান থেকে একেবারে ইস্পাতবরণ। ওপারের ধুসর চড়ায় সাদা রঙের সারি সারি তাঁবু, কোনো কোনোটির উপরে উড়ছে লাল বা গেরুয়া রঙের নিশান। ডানদিকে এক বৃহদাকার ইলেকট্রিক নাগর-দোলা অবিরাম ঘুরেই চলেছে। সাধুদের মিলনমেলার ও'দিকে জমে উঠেছে গ্রাম্যমেলার পশরা সাজানো প্রেক্ষাপট। এরকম বিস্তৃত উদার দৃশ্য কুম্ভমেলার ছাপানো ছবিতেই শুধু দেখেছি। ক্যামেরা তাক করে আমিও একটা ছবি তুলে নিলাম। শব্দও হল, ক্লিক! কিন্তু সামনের এ ছবি কতটা যে ক্যামেরায় ধরা পড়বে জানি না। অন্ততঃ এই দৃশ্য চোখে দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল যে ভাললাগায়, সেটুকু যে উঠবে না তা ভাল করেই জানি। আরতিদি হাত থেকে ক্যামেরাটা টেনে নিয়ে আমাদের পাশাপাশি ছবি তুলে নিলেন একটা। এপাশেও পাহাড়ের গায়ে নানারঙা মরশুমী ফুলের সাজানো বাগান যেন রামধনুর বাহার ছড়িয়ে রেখেছে। ওঁরা সামনে তাকিয়ে এদিকটাই দেখতে পাচ্ছিলেন। গঙ্গামুখী দৃশ্য দেখে আমার উচ্ছ্বাসের বহর দেখে আরতিদি কড়ার করে রাখলেন যে ফেরার পথে এদিকের সীট দুটোতে ওঁরাই বসবেন। দড়িতে ঝোলানো বাক্সগাড়ি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঠিক পাহাড়ের চূড়ায় নামিয়ে দিল আমাদের। বাঁদিকে খানিকটা নেমে যেতে হবে মন্দিরে। কালোপাথরে চমৎকার সিঁড়ি কাটানো আছে আসা যাওয়ার পথ ভাগ করে। কিন্তু একি—সিঁড়ির শেষাশেষি গিয়ে আতঙ্কে থমকে যাই। সামনের চাতালে কি

অসংখ্য মানুষ। মনে হচ্ছে নড়ছে চড়ছে যেন এক দুর্ভেদ্য মানুষের দুর্গ। নীচের সেই দূরবিসর্পী লাইনে জমে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা ওপরে উঠে একসঙ্গে এখানে এই সংকীর্ণ চাতালে জমা হয়েছে। রোপওয়ে থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আর পায়ে হাঁটা পাকদণ্ডী দিয়ে উঠে পিঁপড়ের মতো কত অসংখ্য মানুষ যে প্রতি মুহূর্তে সেই অমানুষিক জনতায় মিশে যাচ্ছে। কি জানি কোথায় যাচ্ছে। আমি শুধু দেখছি জনতা নড়ছে চড়ছে আর বহুকণ্ঠের কোলাহলে ফেটে পড়ছে এক চাপা রোষধ্বনিত সমুদ্রকল্লোল। এই জনসমুদ্রে নামা মানে নুনের পুতুল সাগরে নামার অবস্থা হবে। চকিতে চোখে পড়ে ভিড়ের মধ্যে দুহাত ওপরে তুলে নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে কেউ, কিন্তু বেরোতে পারছে না আবার ডুবে যাচ্ছে সেই কল্লোলিত জনতাকে ভেদ করবার চেষ্টায়। যে কজন অবশেষে বেরিয়ে আসছে, চুল এলোমেলো, অবিন্যস্ত শুধু নয়, প্রায় ছিন্ন জামাকাপড়। উদভ্রান্ত মুখে চোখে ভক্তির চেয়ে ভীতির চিহ্নই প্রকট হয়ে ফুটেছে। মাথায় থাকুন মা মনসা। আমি সিঁড়ির কিনারে ঠেস দিয়ে বসি। অবশ্য আনন্দকে তো ঠেকানো যাবে না। দেবস্থানে ভিড় তাঁকে আরো উদ্বোধিত করে। এরকম জায়গায় আমি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নীতিতে ঘোরতর বিশ্বাসী। ওদিকে শোভনাদির বাবাও মহোৎসাহে ঐ জনতার অভিমুখে পা বাড়াচ্ছিলেন। শোভনাদি প্রথমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে না পেরে শেষে খানিকটা বকুনি দিয়েই বসিয়ে দিলেন। নিরুপায় বৃদ্ধ শেষে এখান থেকেই সজোরে স্তব উচ্চারণ করে দেবীকে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে লাগলেন—

ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনীবাসুকেস্তথা।
জরৎকারুর্মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥
জরৎকারুজগদ্‌গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥

জরৎকারু প্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরেতি চ
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥

মায়ের কাছে—বাবার প্রতিভূ হয়ে পুজো দিতে মেয়ে ওদিকে গাছ-কোমর বেঁধে রওনা হলেন। নীরবে সঙ্গে গেলেন তদীয় স্বামী, আমাদের সাহাদা। ওঁদের এই পারিবারিক ছবিটি বেশ মজার। বৃদ্ধবাবা স্বেচ্ছাময় শিশুর মতোই সবজায়গায় নিজের ঝোঁকে এগিয়ে যান। মায়ের স্নেহে তাঁকে সর্বদা আগলে চলেন আমাদের শোভনাদি। আর স্ত্রীকে আগলানোয় ব্যস্ত দাদা আমাদের পরিহাসে কান না দিয়ে নিজের কাজ করে চলেন চুপচাপ। এঁদের এই জনতা ভেদ করে মন্দিরে ঢোকার যুদ্ধে কম সময় লাগবে না। বসে বসে দেখতে লাগলাম চারপাশের ছবি। এত ওপর থেকে বহুদূর একসঙ্গে ধরা যায় বলে ছবিটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার এরোপ্লেন থেকে দেখার মত অতটা বেশী দূরত্ব বা দ্রুততা না থাকায় সবকিছু আলাদা করে চিনে নেবার আনন্দটাও থাকে। এদিকে হর-কী-প্যারী, নদীর ওপারে কনখল, এধারে রেলস্টেশন, তার ওধারে সপ্তধারার সীমা ছুঁয়ে পাহাড়ের নিচ পর্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত দৃশ্য বড় চমৎকার। হরিদ্বারকে সমতলে বসে এতদিন যেভাবে দেখেছি, আজ তাকে নতুন করে, সম্পূর্ণ করে দেখলাম। আর কুম্ভমেলার সাজে সে রূপ আরো সর্বাঙ্গসুন্দর, যেন সর্বাভরণভূষিতা। হিমালয় গঙ্গা আর মানুষ— এই তিনে মিলে চেতনার ত্রিমাত্রিক স্তরের প্রতীক এই উদার দৃশ্য কুম্ভের পরিপূর্ণ ছবিটি একেবারে চোখের সামনে মেলে ধরল।

অরুণদা ঘুরে ঘুরে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এতক্ষণ একমনে চার-দিকের ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ দেখি ক্যামেরা গুটিয়ে ঝোলায় রেখে সিঁড়ির ঘেরের বাইরে এক বিশাল বটের তলায় বসে পড়েছেন। সামনে এক সাধুবাবা আসন করে বসে। হয়তো সাধুবাবার ছবি তুলছিলেন, কথা বলতে বলতে বসে পড়েছেন। আরতিদির কিন্তু ভাল লাগে না সাধুর সঙ্গে এই আলাপ। অরুণদার নাকি কুষ্ঠিতে

আছে সাধুসঙ্গ ও সংসারে বৈরাগ্য। সেজন্য আরতিদির মনে একটু গোপন অস্বস্তি সবসময়ই খচখচ করে। আমাকে বলেন, 'চলো দেখে আসি ওখানে আবার কি হচ্ছে।' অগত্যা সঙ্গে যাই। সামনে যেতেই সাধু বলেন, এই যে মায়ীলোগ এসে গেছেন। মায়ের জন্যই তো বাবার যত মান। ভগবান শঙ্করাচার্যও তো বলেছেন,

কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণি গ্রহণপরিপাটী ফলমিদম্॥

নরকপালধারী, ভূতনাথ মহেশ্বরও জগদীশ্বর হয়েছেন শুধু জগন্মাতা ঈশানীকে বিবাহ করেই। কথাশেষে হাহা করে হাসতে থাকেন সাধু। কথা শুনে ভক্তি জাগে। সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যাপার বুঝি না। তবে সংসারাশ্রম সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। আরতিদি গললগ্নীবাসে ভূমিষ্ঠ হয়ে তারপর অরুণদার পাশে বসে পড়েন। আমিও বসি। সাধুবাবার পিছনে দেখি আর একজন সাধু বসে কল্কের সপ্তমী সাজাচ্ছেন। ইনি বোধ হয় সাধুবাবার জুনিয়ার। এখনও প্রোবেশনে আছেন। কল্কেটিও দেখার মত। মনে হয় স্পেশাল অর্ডারে তৈরী। ওপরটা ঝকঝকে পেতলের। তলায় ব্যাকেলাইটের মত তাপনিরোধক হাতল লাগানো। সাধুবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গাঁজা, চরস আর ভাং তো সাধুদের নিত্য ব্যবহার্য। হরিদ্বারে এ তিনই চলে। তোমাদের ওই বোতলের মাল—সেইটা এখানে চলে না।'

'কিন্তু শুনেছি যে শাক্তপূজায় ও বস্তুটি নাকি আবশ্যপ্রয়োজন।'

'তোমরা তো ওইরকমই শোন। একথা শোননি যে তার জায়গায় ডাবের জল, মিশ্রীর জল অথবা তাম্রাধারের জলও অনুকল্প হিসেবে দেওয়া যায়? আরে, এ সবই হ'ল বাইরের কথা। শক্তিপূজা কি এত সহজ যে, যে কেউ এ নিয়ে কথা বলতে আসে? তন্ত্রের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের একটি দরজা বীরাচার। বাকী নশো নিরানব্বইটি দ্বারপথের কি খবর জানো তুমি? কথা বলতে বলতে

সাধুবাবার স্বরে ক্রমশঃ উত্তেজনার সুর লাগছে। সপ্তমীর ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও চড়ছে।

অরুণদা আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ছেড়ে দিন বাবা এই অজ্ঞানদের ফালতু বাৎ। সাধনার কথা আমরা কি জানি! আমরা শুধু আপনাদের চরণে প্রণাম করতেই এসেছি।'

বাবার রাগ কিন্তু পাড়ে না, 'হ্যাঁ, দুচারটে বই পড়ে এসে সব আমাদের সাধনার কথা আলোচনা করে। আরে বাবা সাধনশীল না হলে শুধু বই পড়েই কি তত্ত্ব বোঝা যায়! যে সাঁতার জানে না সে কি করে বুঝবে ঢেউয়ের দোলায় ভাসার সুখটা কেমন!'

বাবার উচ্চকণ্ঠের ঠেঁটী হিন্দীতে এই ভাষণ শুনে চারদিকে এরমধ্যে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করে উঠে পড়ি। সত্যিই তো, কিছুই জানি না শুনি না—হঠাৎ একেবারে শাক্তপূজার কারণ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করার ধৃষ্টতা দেখানোটা খুবই অন্যায় হয়েছে। মাথা নিচু করে ফিরে আসছি বাবা হঠাৎ ডেকে বললেন, 'একটা কথা শুধু শুনে যাও, সব সাধনারই মূল কথা ভেতরের আত্মার পরিচয় পাওয়া। কঠোর তপস্যায় সাধুরা সে পথে কতটা এগিয়েছেন তোমরা সংসারের ভোগে আবিল চোখে তা কি করে দেখবে। দূর থেকে শুধু ভুলই দেখবে। সেই ভুল না করে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কর্ম করো, যাতে সেই দূরকে একদিন কাছে আনতে পারো।'

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সাধুবাবা নীরবে কল্কে হাতে ধূমপান করে যান। মুহূর্ত-আগের দুর্বাসা মূর্তির কোন চিহ্নই এখন নেই। আত্মসমাহিত চোখে দূরে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছেন। আমার মনে এখন আর বিন্দুমাত্র অনুশোচনার গ্লানি নেই। নিজেকে চালাক দেখাতে চাইলেই যত বোকামির জন্য লজ্জা। যেখানে আমার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়টা সবটুকু জানা, সেখানে আর আবরণের মোহ কিসের। তবু, একটা 'কিন্তু' যেন কেমন

খচ্‌খচ্‌ করে। শক্তিমানের কাছেই তো আমরা ক্ষমার শক্তি দেখতে চাই।

ফেরার পথে অরুণদাকে জিজ্ঞেস করি, সাধুবাবার সঙ্গে কিভাবে আলাপ হ'ল। বললেন, ওঁর দিকে ক্যামেরা তাক করতেই মৃদু হাসলেন। ছবি তোলা হয়ে যেতে হাত নেড়ে ডাকলেন। বললেন, চারিদিকে ঘুরে সবকিছু ভাল করে দেখে নাও। এই পবিত্রকুণ্ডে কত মহাপুরুষ এখানে প্রকট হয়েছেন। তাঁদের আশীর্বাদ পেলে ধন্য হয়ে যাবে জীবন।

'আচ্ছা, এই মহাপুরুষরা এখানে আসেন কেন? তাঁদের তো আর পুণ্যার্জনের তাগিদ নেই?'

'তাঁরা আসেন আমাদের জন্য। আমার মত মানুষকে আশীর্বাদ দিতে। চৈতন্যচরিতামৃতে পড়োনি,

'তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥'

একথা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। শ্রীভগবানের প্রকটমূর্তি সিদ্ধসাধুরাই তীর্থকে তীর্থত্ব দান করেন তাঁদের উপস্থিতি দিয়ে:

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থাভূতা স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি সান্তঃ স্থেন গঙ্গাভৃতা।

আজ এই সাধুর অসহিষ্ণু রোষমূর্তিতে অরুণদা সেই কল্যাণী করুণার ছবিই দেখতে পেয়েছেন। যে যেমন ভাবে ডাকে, তার কাছে সেই মূর্তিই প্রকট হয়। নিজের মন নিয়ে অন্যের ভাবের ঘরে ঢোকা এ রাজ্যে বেআইনী।

মনসা পাহাড় থেকে যখন নেমে এলাম তখন বেলা দুটো। যেমন সূর্যের তেজ, তেমনি তেতেছে পায়ের নিচে পাথুরে মাটি। ক্লান্তিতে, তেষ্টায় সমস্ত শরীর যেন শুষে যাচ্ছে কোনরকমে তিন তলায় উঠে ধপ করে বসে পড়লাম। ফরাসের বিছানা তো অষ্টপ্রহর বিছানোই থাকে। এই দুপুরে ট্যাঙ্কের জলও শেষ হয়ে গেছে। স্নান

ঘুরে থাক, হাতপা ধোয়ারও প্রশ্ন নেই। ভাতের থালা টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করলেই হ'ল। আরতিদিকে বোঝাই, তীর্থে এসে এসব সংস্কার যদি ছাড়তে না পারলাম তাহলে আর লাভ কি হ'ল! মনটাকে জগন্নাথক্ষেত্র করতে হবে। তবেই তো মহাপ্রসাদ লাভ করা যাবে।

'সে তোমরা যা ইচ্ছে লাভ কর বাপু, খেয়ে উঠে জায়গাটায় একটু গোবরজল দিও। এঁটো মাড়িয়ে আমি বিছানায় উঠে শুতে পারব না।' বাণীদির কথায় বাধ্যভাবে ঘাড় নাড়ি। শাস্ত্রে নাকি আছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে যেমন তার সঙ্গে তেমন-ভাবেই চলতে হবে। অন্তত বাণীদির সামনে সংস্কার মোচনের বক্তৃতা দেওয়ার দুঃসহাস আমার নেই। আজ যেন ঘরটা আরো ভর্তি লাগছে। দরজা ঘেঁষে আরও দুটো গদি পড়েছে। হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক চোখে হাতচাপা দিয়ে শুয়ে আছেন। পাশের বিছানায় বসে চশমা চোখে শালোয়ার কামিজ পরা শীর্ণা এক মহিলা কলকব্জাখুলে ছড়িয়ে টেপরেকর্ডার পরিষ্কার করছেন। ইরাদি আজ বাজার ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে আগেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন। প্রসন্ন চোখে তাকাতে দেখে জানালেন, ওঁরা দুজন স্বামী স্ত্রী জার্নালিস্ট, কুম্ভের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছেন।

জার্নালিস্ট তো প্রেসের আড্ডায় গেলেই হয়. আমাদের এই মহিলামহলের প্রাইভেসীর ওপরে হামলা কেন। অন্ততঃ ভদ্রলোক তো পাশের পুরুষদের ঘরে অনায়াসে যেতে পারতেন। মনে মনে সুবলবাবুর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠি। বৈরাগী সাধুদের সামনে সঙ্কোচ নেই কারণ আমরা তাঁদের মনোযোগের যোগ্যই নয়। কিন্তু এইসব জার্নালিস্টরা অতি ভয়ঙ্কর জীব, কখন বেফাঁস কি দেখে ফেলবে তারপর কাগজে বের করে দিলেই হ'ল। আমের চাটনিতে ডুবিয়ে মচ্‌মচ্‌ করে পাঁপর চিবোতে চিবোতে দেখি ভদ্রমহিলা টেপ্‌রেকর্ডার গুছিয়ে রেখে এবার ক্যামেরা বের করলেন। এসব

জিনিস যে আবার এরকম পুরোপুরি খুলে ফেলে তেল মাখাতে হয় তাই বা কে জানত! শুনেছি মা সারদামণি নাকি একজন ভক্ত-মহিলার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে তাঁর খুব বুদ্ধি কারণ সে ঘড়িতে দম দিতে জানে! এসব কলকব্জার ব্যাপারে আমার বুদ্ধির দৌড়ও ওই পর্যন্তই। আর সারদামণির মত পরকে প্রশংসা করার উদারতা তো নেই। খানিকটা ঈর্ষাসঞ্জাত অস্বস্তি নিয়ে ভদ্রমহিলার কার্যকলাপ দেখতে থাকি। ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে আগরতলার মাসীমা পাতে একটু বাঁশের কোঁড়ের আচার দিলেন। বাড়ির জন্য কিনছেন। সামনে আমাদের না দিয়ে কি করে নিয়ে যান! বার বার করে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এই রকম দল করে সবাই মিলে যেন একবার ওঁদের বাড়ি বেড়িয়ে আসি। ওখানে ত্রিপুরেশ্বরী মহাকালীর মন্দির আছে। শুনে রাজর্ষির গল্প মনে পড়ল। সেই দেবীমূর্তিকে কেন্দ্র করে রঘুপতি জয়সিংহ আর গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতাই না ঘটেছিল। এইরকম সব অনুষঙ্গ থেকে কোনো বিশেষ স্থান সম্বন্ধে যখন মনে একটা ধারণা তৈরী হয়ে যায়, তারপর সেখানে গেলে বড় আশাভঙ্গ হয়। একথা তো সত্যি যে বাস্তব কখনো কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। মনে আছে কাশ্মীরে মার্তণ্ডমন্দির দেখার কথা। আমি তো সারাপথ 'তপতী'র সুমিত্রার কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। তারপর সেই পাঁড় ব্যবসায়ী ধর্মস্থানের ইতিহাসজ্ঞানহীন পাণ্ডা আর পথের পাশে হাত পেতে থাকা সুচতুরা কাশ্মীর নন্দিনীদের দেখে শুধু আফসোস করেছি, কেন এলাম! 'তপতী' পড়বার সময় আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি সেই ছবিটাকে ভুলে যেতে। আগরতলার মাসীমার কথায় ঘাড় নেড়ে বলি : 'নিশ্চয়ই যেতে চেষ্টা করব'—মনে মনে জানি, ঐ ত্রিপুরেশ্বরী না থাকলে হয়তো সত্যি চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন চেষ্টা করবো না-যেতে। মাসীমা বলেন স্টেশন রোডেই ওঁদের বাড়ি আর অফিস পাশাপাশি। একটা মজার ব্যাপার দেখছি,

এই যাত্রীস্পেশালে যাঁরা এসেছেন,—অন্ততঃ যাঁরা আমাদের সঙ্গে এ বাড়িতে উঠেছেন, তাঁরা সবাই ব্যবসায়ী। শোভনাদিদের গড়িয়াহাটে কাপড়ের দোকান; রবিদাদেরও তাই। অরুণদা ডাক্তার। রাণুদিদের খাগড়াই বাসনের আড়ত। আর বাণীদির স্বামী তো হাওড়ায় বিশাল এক বাজারই বসিয়ে গেছেন। তিনি গত হওয়ার পর ছেলেরা বাজারের হিসেব দেখে, আর রাণুদি বেশীর ভাগ সময় তীর্থ করেই কাটান। আজকালকার তীর্থ মানে তো আর আগের দিনের মত চালচিঁড়ে বেঁধে হাঁটাপথে বেরিয়ে পড়া নয়। অন্ততঃ এই স্পেশালের মাশুল তো বেশ মোটাই। চাকুরেদের এল. টি. সি. র টাকায় মেটানো মুশকিল। সেইজন্যই শুধু এই বিশেষ স্পেশালের দলেই ব্যবসায়ীদের ভিড়, না সামগ্রিকভাবেই তীর্থযাত্রী-দের মধ্যে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশী—অর্থাৎ ব্যবসায়ীরাই বেশী পুণ্য অর্জনে আগ্রহী কিনা এ বিষয়ে আমার একটু তথ্যভিত্তিক গবেষণা করার ইচ্ছে। না না. আমি ব্যবসায়ীদের পাপ মোচনের প্রবণতার দিকে কোন ইঙ্গিত করছি না। আর, আমার পক্ষেও তো এ প্রসঙ্গটা মোটেই পরচর্চা নয়, কাজেই নিছক কৌতূহল হিসেবে কিংবা ব্যবসায়ী পরিবারের দৃষ্টিতে আত্মসমালোচনা হিসেবেও ব্যাপারটাকে নেওয়া যেতে পারে। ভেজানো দরজা ঠেলে মিসেস সেন ঘরে এলেন। ইনি আমাদের স্পেশালেরই সহযাত্রিণী। জায়গা পেয়েছেন কৈলাস হোটেলে। ট্রেনে আমাদের কাছাকাছিই ছিলেন। ইরাদি আর মণিকার সঙ্গে খুব জমে গিয়েছিল। কথায় কথায় বেরোলো ইনি ইরাদির বাপের বাড়ির দেশের অর্থাৎ পাটনার মেয়ে। কথায় বলে বাপের বাড়ির দেশের কাকের ডাকটাও নাকি কানে মিষ্টি লাগে। সেই সুবাদে এ দুদিন ইরাদির সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছেন। কাল সন্ধ্যায় সিনেমাতেও গিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কথা হতে হতে ইরাদি বললেন, 'তুমি কিন্তু ভাই কাল টিকিটের টাকাটা আমায় দাওনি।'

'সে কি ইরাদি, আমিই তো সবার আগে টাকা দিলাম।'

'না, টাকা দেবার সময় তুমি শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে স্টীল ফোটোগুলো দেখছিলে।'

'তুমি ভুল করছ ইরাদি, তার আগেই তো আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি।'

এই সংলাপের মাঝখানে বাণীদি হঠাৎ বালিশ থেকে মাথাটা তুলে শুধু একটি সেনটেন্স বললেন, 'ওই টাকাটা কাল মোটেই দেওয়া হয়নি।' গলার স্বরে কি আত্মবিশ্বাস। ভঙ্গিতে যেন ভিক্টোরিয়ার মহিমা। মুহূর্তে সারা ঘর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

শেষে একটু পরে নীরবতা ভঙ্গ করলেন মিসেস সেনই। 'কি রকম গরম পড়েছে, আমি এবার তাহলে হোটেলেই চলে যাই।' তারপর আমার মাথার পাশ থেকে রিডার্স ডাইজেস্টটা হাতে তুলে নিয়ে সপ্রতিভ বেরিয়ে গেলেন। আমি চুপ করে দেখছিলাম। খোদ বাণীদির বিচার অগ্রাহ্য করে তারপরেও যিনি অনায়াসে বিনাপ্রশ্নে অন্যের বইটা তুলে নিয়ে চলে যেতে পারেন, তাঁকে কিছু বলার দুঃসাহস আমার নেই। মণিকাও এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যাওয়ার পর বললো, 'ওই বইটা তোর না?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে গেল আর তুই কিছু বললি না?'

'তুইও তো বলতে পারতিস।'

'এই তোদের জন্যই তো ওরা এতটা সাহস পায়' বলতে বলতে উত্তেজনায় বাণীদি উঠে বসলেন। 'ইরার কাছে ঐ টাকাটা কিছুই না জানি। কিন্তু তীর্থে এসে এভাবে ঠকানো যে মহাপাপ। সে পাপ ওকে করতে দেবো কেন!'

সর্বনাশ! তীর্থে এসে পরকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করার উৎসাহী বিবেকের ভূমিকায় আমি নেই। ঘুমের ভান করে তাড়াতাড়ি পাশ

ফিরলাম। দরজায় আবার টক্‌টক্‌ টোকা। হরি মুখ বাড়িয়ে বললো, 'মিতুদিদির গেস্ট এসেছেন।'

আমার গেস্ট! এখানে আবার আমার গেস্ট কে আসবে! খুব অবাক হয়ে উঠে দরজার পাল্লাটা ঠেলতেই—সামনে দাঁড়িয়ে রাধা। এত অভাবিত, এত আশ্চর্য যে রাধাকে চিনতে আমার ক'মুহূর্ত সময় লাগল। 'রাধা তুই! কি করে এলি? প্রবাল কোথায়? খুব ভালো হ'ল তোকে এখানে নিয়ে এসেছে।' রাধার হাত ধরে এনে ঘরে বসাই।

রাধা আমার চোখের দিকে তাকায় না। তখন চোখে পড়ে ওর কপালে আঠা দিয়ে আটকানো বড় খয়েরী টিপটা থাকলেও সিঁথি খালি হাতে শাঁখা নেই, লোহা নেই, শুধু চুড়ি আর ঘড়ি। এইজন্যই রাধাকে হঠাৎ এত অচেনা লেগেছিল। ইরাদি, মণিকারা সকৌতূহলে তাকিয়ে আছে। আমি চোখ নামিয়ে নিই।

'চা খাবি রাধা?'

'শুধু চা কেন, সবকিছুই খাব। ওঘরে দাদার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আমি এক'দিন তোমাদের সঙ্গেই থাকব।'

'বাঃ, সে তো ভাল কথাই। চল্‌ তাহলে একেবারে গঙ্গায় স্নান সেরে এসে বসি। আজ সকালে গোলেমালে আমাদের স্নান করাই হয়নি।'

হরি একটা এয়ারব্যাগ আর স্যুটকেস নিয়ে ঢোকে। ঘরের কোণের স্তূপ থেকে গদি পেড়ে এনে আমার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে বিছিয়ে দেয়।

'মিতুদি, আমাকে একটা চাদর ধার দিতে হবে কিন্তু। বালিশ বরং বিকেলে বাজার থেকে কিনে নেব। কই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না'? জিনিসপত্র বের করতে করতে কলকল করে কথা বলে রাধা। ওকে জানি বলেই বুঝি এ আসলে কথা নয়, কথা চাপা দেওয়ার জন্য কিছু কোলাহল। আমিও তো রাধারই

দিদি। হেসে বলি, 'হ্যাঁ, এই যে আমার পাশে মণিকা। ওই শোভনাদি ইরাদি আর আগরতলার মাসীমা এদিকে পান সাজছেন রেণুদি। আর এ আমাদের রাধা।'

'কোথা থেকে আসছেন ভাই?'

'কলকাতা থেকে।' এককথায় ইরাদির প্রশ্নের জবাব দিয়ে জামাকাপড় হাতে উঠে দাঁড়ায় রাধা, 'চলো মিতুদি, স্নানটা এইবারে সেরেই আসি।'

বাইরে রোদের তাত এখনো পড়েনি। আনন্দদের এসময় ডাকলেও যাবে না। তাছাড়া আমি একটু রাধার সঙ্গে একলা হতে চাই। জামাকাপড় তোয়ালে হাতে নিয়ে তাই সোজা রাস্তায় নেমে আসি। ভোলাগিরির ঘাটটা সামনেই। সেখানে এখন ভিড়ও বেশী নেই। কিন্তু সামনে ঘাট পেলেও কখনো কখনো কিছুতেই থেমে যেতে ইচ্ছে করে না। রাধাকে নিয়ে হর-কী-প্যারীর দিকেই এগিয়ে চলি। এখানে ভিড়ের স্রোত সর্বদাই বহমান। ঘাটের পাশে কাপড় রেখে একটা একটা করে সিঁড়ি নামি। হাঁটু পর্যন্ত জল, কিন্তু কি প্রচণ্ড স্রোত। আনন্দদের ছাড়া একলা দুজনে এভাবে স্নান করতে আসা মোটেই ঠিক হয়নি। অমাবস্যার দিন বাঁধে স্রোত আটকে রাখায় স্নান করতে কোন অসুবিধা হয়নি। আজ থেকে আবার জল ছেড়ে দিয়েছে। এখন সংক্রান্তি পর্যন্ত বোধহয় এমনি জোরে ছাড়াই থাকবে। স্রোত আটকে দিলে তাতে ময়লাও আটকে যায়। কিন্তু ময়লা ভাসাতে গিয়ে সঙ্গে যদি আমরাও ভেসে চলে যাই' রাধা আমার ভাব বুঝে হাসে, 'ভয় পাচ্ছো মিতুদি, আমার হাত ধরো।'

আমি জানি রাধা সাঁতার জানে না। আর এই স্রোতে সাঁতার জানা না জানা সমান। কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে কোন ব্রীজের থামে কিংবা বোল্ডারের ওপর আছড়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। কোনোরকমে দুটো ডুব দিয়েই উঠে পড়ি। রাধা তখনো জলে। ঢেউয়ের তালের সঙ্গে দুহাত দুলিয়ে খেলার ছলে অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে

আছে। ওর মুখে কতবার শোনা জলভরার গানটা মনে পড়ে গেল।

শূন্য প্রাণের গাগরী শিরে নিতি আসি প্রেম যমুনার তীরে
অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ নীরে শুনি তব বাঁশরী সাধা ॥

কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক শুনেই রাধা চিরকাল ঘর ছেড়ে আসে। কিন্তু ডেকে এনেও ফাঁকি দেওয়ার এই চতুরালি আমার বড় নিষ্ঠুর লাগে। আমার সামনে এই গানটা গাইলে কতবার ওকে থামিয়ে দিয়েছি। 'রাধা শীগগীর উঠে আয়, এরপরে আরতির ভিড় লেগে যাবে।' সত্যি, ভিড় আস্তে আস্তে বেশ জমে উঠছে। রোদের তেজ পড়ে গেছে। হাওয়ায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা। আমরাও সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ি। মাইকে মৃদুমন্দ্রে বেজে ওঠে গঙ্গা আরতি—

জয় গঙ্গে মাতা শ্রীজয় গঙ্গে মাতা।
জো নর তুমকো ধ্যাতা মনবাঞ্ছিত ফল পাতা ॥
চন্দ্রসী জ্যোৎতুম্হারী জল নির্মল আতা।
শরণ পড়ে যো তেরী, সো নর তর যাতা ॥
পুত্র সগর কো তারে সব জগকো জ্ঞাতা।
কৃপাদৃষ্টি তুম্হারী ত্রিভুবন সুখ দাতা ॥
আরত্তি মাত: তুম্হারী যো জন নিত্যগাতা
অর্জন য়ুঁহী সহজ মেঁ মুক্তি কো পাতা ॥

আশেপাশে ছেলে বুড়ো সকলেই হাতে তালি দিয়ে দিয়ে গাইছে। উত্তরভারতের এই সকলে মিলে আরত্তিগানের প্রথাটা আমার বড় ভাল লাগে। মানসধ্যান খুব বড় কথা। আবার খুব বড় আধার না হলেও যে তা মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই যে সকলে গলা মিলিয়ে গাওয়া, কণ্ঠে এবং কানের এই সংগতের ফলে একাগ্রতার এক অবশ্যম্ভাবী পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। মনের মধ্যে অন্য কোনো চিন্তার অবকাশই থাকে না। মনে আছে বৈষ্ণোদেবীর পথে পাঠান-কোট থেকে কাটারার বাসে চড়েছি। স্টার্ট দেওয়া মাত্র সকলে এক-

যোগে ধ্বনি উচ্চারণ করল 'জয় মাতাদী।' তারপর সারাপথ ধরে চলল সোৎসাহ জয়ধ্বনি—

জোর সে বোলো জয় মাতাদী
প্রেম সে বোলো জয় মাতাদী
ফিরসে বোলো জয় মাতাদী
আখরী বোলো জয় মাতাদী

মাঝে মাঝে এক একজন এক একটি স্তোত্রপদ ধরছেন আর সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনির ধুয়ো ধরছেন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সারাপথ এই চলল। লজ্জা সংকোচের কোন বালাই নেই। এতো অন্যকে গান শোনানো নয়, পরমের উদ্দেশ্যে নিজের আর্তিকে শব্দময় করে তুলে নিজেকেই ফিরে শোনানো। আর কাটরার পর থেকে হাঁটা পথে তো ধ্বনি আরো উচ্চরব। অসংখ্য নারীপুরুষ পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠছেন আর স্তোত্রগাথায়-জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে আকাশ বাতাস। ধ্বনির প্রভাবে অশক্তের দেহে মনে জাগছে উদ্দীপনা, ভক্তির আবেগ হয়ে উঠছে উদ্বেল। এইভাবে হৃদয় হয়ে উঠছে পরম উপলব্ধির জন্য অনুকূল। কলিতে হরিনামের উচ্চারণকেই একমাত্র গতি বলা হয়েছে কেন, এইরকম সার্বিক আবিষ্ট উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতেই তার তাৎপর্য বোঝা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, 'দেবতায়া শরীরস্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্'—অর্থাৎ দেবতার শরীর বীজমন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়। তাই ইষ্টদেবতার মূর্তিকে মন্ত্রঘটকীভূতা প্রতিমা বলা হয়। মন্ত্রজপ করতে করতে সাধকের চিন্তায় তথা হৃদয়ে দেবতার মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর সেই মূর্তির রূপ, তাঁর মহিমা এভাবে উচ্চারণ করতে থাকলে হৃদয়ে তাঁর স্বরূপ কি অন্তত: কিছুটাও সত্য হয়ে উঠবে না! এই প্রসঙ্গে আমারই একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। সেও কাশ্মীরেরই আরেক পার্বত্যপথে। জম্মু থেকে বাসে যাচ্ছি বানিহালের দিকে। মূল গন্তব্য অমরনাথ। সকালে বাস ছাড়তেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। কখন যে

পৌঁছব কিছু ঠিক নেই। রাত ক্রমে গভীর হচ্ছে। কমে আসছে আশেপাশে অন্য গাড়ির যাতায়াতের শব্দ। ক্রমে কমতে কমতে সে শব্দ একেবারেই থেমে গেল। অন্ধকার পথে শুধু আমাদের যন্ত্রবাহন ক্লান্ত গর্জন করে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। অবশেষে হঠাৎ একটা বিকৃত আর্তনাদ করে সেও পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে ছুটো বাঁকের মাঝে পথটা একটু সমতল চত্বরের মতো তাই বাসটা গড়িয়ে না গিয়ে স্থির দাঁড়াতে পেরেছিল। টর্চ নিয়ে ড্রাইভার বনেট খুলে খানিকক্ষণ ঠুকঠাক করে শেষে জানালো যে গাড়ি আর যাবে না। চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার। শ্রাবণী-পূর্ণিমার আগের অমাবস্থার কাছাকাছি তিথি সেটা। মেঘে ঢাকা আকাশে তারা দেখা যায় না। শুধু পথের ওপরে নিচে অসংখ্য জোনাকী অনবরত জ্বলছে নিভছে। ড্রাইভারের হেল্পার ভেতরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে বললো যে জঙ্গলে জানোয়ার আছে, কাজেই জানালার কাচগুলো যেন বন্ধ রাখা হয়। অন্ধকারে বন্ধ গাড়িতে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। কথা বলতেও ভয়। কি জানি, শব্দ শুনে জানোয়ারাও যদি এদিকে আলাপ করতে এগিয়ে আসে। সহযাত্রীদেরও কাউকেই প্রায় চিনি না। চেহারা আর আচরণে তারা আমাদের থেকে এতটাই আলাদা যে সারাদিনে কারও সঙ্গে আলাপ করতেও উৎসাহ বোধ করিনি। আন্দাজে বুঝছি বাসশুদ্ধ সকলেরই প্রায় আমাদের মতই অবস্থা। ব্যতিক্রম শুধু জনাদশেকের তাগড়াই চেহারার একটি অবাঙালী দল। বড়বাজারে এদের মোটর পার্টসের ব্যবসা। অন্ধকারেই তারা সশব্দ কৌতুকে কেন জানিনা বারে বারে হেসে উঠছে। সরসভাবে আলোচনা করছে আচমকা বাঁকের ওধার থেকে এসে মিলিটারী ভারী লরী এসে পড়লে কিভাবে আমাদের বাসসমেতগড়িয়ে অতল খাদে সমাধি নিতে হবে। হৈ চৈ করে টর্চ জ্বেলে পোঁটলাপুঁটলী খুলে গাঠিয়া আর বেসনবড়া সহযোগে তাদের নৈশ জলযোগও সারা হল। আরও খানিকক্ষণ

কথাবার্তার পর হাতে তালি দিয়ে তারা শুরু করল ক্যাসেটের কল্যাণে বহুপ্রচারিত এই ভজন—জয় জগদীশ হরে। শুনতে শুনতে সরল সুরের একাগ্রতায় আমাদের অস্বস্তির প্রাচীরে কখন যে ফাটল ধরিয়েছে। আস্তে আস্তে হাতে তালি দিয়ে আমরাও কখন গলা মিলিয়েছি। একে একে বাসশুদ্ধ সকলেই সেই গানে যোগ দিয়েছে। বারে বারে একই পদ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছে। অন্ধকারের বুকচাপা ভার যেন ক্রমশ কমে আসছে। একবাস লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বরক্ষেপণের ধারা মিলে-মিশে আশ্চর্য এক জোয়ারীর তরঙ্গে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে বেজে উঠছে সুর। বয়ে যাচ্ছে যেন এক অলৌকিক অভয়ের অনুভূতি সমগ্র পরিবেশের ভারী বোঝাটাকে হাল্কা করে দিয়ে। ক্রমে আকাশের মেঘ কেটে তারা দেখা দিল। দেখা দিল পাহাড়ের মাথা ঘেঁষে শীর্ণ চাঁদের ফালি। সেই ম্লান আলোকে অচল বাসের মধ্যে বন্দী মানুষগুলি সেই রাতে ঐ গানের জাদুপ্রভাবে যে কী উজ্জ্বল অনুভবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সেই একই গান এই হর-কী-প্যারীতে আরতির সময় বসে কতবার শুনেছি। অর্ধমনস্কতায় সকলের সঙ্গে গুনগুনিয়ে উঠেছি কখনো বা। কিন্তু সেই রাতের মত পুরোপুরি মন দিইনি কখনো। তাই ধরা দেয়নি মনের ওপর তার প্রভাব। পাশে তাকিয়ে দেখি রাধা চোখ নীচু করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। আলোর নিচেই অন্ধকার – হর-কী-প্যারীর চারদিকে এখন উজ্জ্বল আলোর সমারোহ। সকলের বিভাসিত চোখ আরতির দীপদণ্ডের দিকে। রাধার মুখের দিকে তাকালে অজানা একটা ভয়ানক ভয় কেমন বুকের মধ্যে থাবা দিয়ে ধরছে। আমি অন্ধকারের দিকে তাকাতে বড় ভয় পাই। রাধাকে বলতে চাই, মুখ তুলে তাকাতে। দেখাতে চাই ওপারে কত আলো কিন্তু বলা হয় না। আরতি শেষ হয়ে আসে। আর মুহূর্তে এক বিশৃঙ্খল ভিড়ের জোয়ারে এলোমেলো হয়ে যায় সব। সব লোক একসঙ্গে

উঠে পড়ে এগোতে চায়। কোনরকমে উঠে দাঁড়াতেই ভিড়ের ঝটকায় অনেকখানি এগিয়ে যাই। এখনি এই অবস্থা। চোদ্দ তারিখ নাগাদ যে কি হবে কে জানে। রাধাকে আর কাছাকাছি দেখতে পাই না। ভিড়ের চাপে কোথায় ছিটকে গেছে। মনে চিন্তা হয়; ওতো পথও চেনে না। এখানে থেকে ঘরে ফিরবে কি ভাবে। ব্রীজের মুখে রেলিংএর থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। পুলিশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। আমাকে তাড়াতে গিয়েও কেন জানি তাড়ায় না। বোধ হয় কারণ মুখ দেখে দয়া হয়—'আপ খো গয়ে?'

'জী হাঁ'।

দূর থেকে দেখি অরুণদা আরতিদি আসছেন। যথারীতি হাতে হাত ধরা। ওঁদের কোথাও হারাবার ভয় নেই। 'একী, তুমি একা দাঁড়িয়ে? ওরা কই?'

'ওরা কারা? আমি তো শুধু রাধার সঙ্গে এসেছি। ভিড়ের মধ্যে আর ওকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে ফিরে চলো। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?'

'রাধা তো পথ চেনে না, ফিরবে কি ভাবে! ওর জন্য দাঁড়াতেই হবে।' এরমধ্যে আবার জার্নালিস্ট-দম্পতি কোথা থেকে এসে পড়েন। দুজনেরই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। ওঁরা কি দুজনেই জার্নালিস্ট—নাকি শুধু স্বামীই! জানতে ইচ্ছে হলেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না। ভদ্রলোক আঠালো হেসে এগিয়ে আসেন, 'মিতু, তুমি এখানে! তোমার বিরহিনী রাধা তো ওদিকে ব্রীজের নীচে দাঁড়িয়ে আছে।' খট্ করে যেন কানের মধ্যে একটা খোঁচা লাগে। ভদ্রলোক অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বড়। তবু একেবারে প্রথম কথাটাতেই এমন ঘনিষ্ঠ নাম ধরে ডাকা! বয়সে ওঁর চেয়ে ছোট হলেও বয়স তো আমার ছোট হয়ে বসে নেই। তারপর আবার 'বিরহিনী রাধা'।

ভদ্রলোক হয়তো কিছু ভেবে বলেননি। কিন্তু আমার মনটা একেবারে বিরূপ হয়ে বেঁকে বসে। চুপচাপ ব্রীজ থেকে নিচের দিকে রওনা হতে আরতিদিরাও নীরবে সঙ্গ ধরেন। কথা ওঁরা কখনোই বেশী বলেন না। কিন্তু চোখের চাউনিতে বুঝি, বোঝেন সব। ব্রীজের নিচের থামে হেলান দিয়ে রাধা দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে তাকিয়ে। কাঁধে হাত রাখতে ফিরে তাকাল, 'এত দেরী করলে, আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

সাত

শোভনাদিরা কাজের মানুষ। চুপচাপ হাতগুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। এখানে তো কাজের মধ্যে সকাল বিকেল এধার ওধার বেড়ানো আর চারবেলা পরিপাটি করে থালাবাটি সাজিয়ে বসে সেবা। রেণুদি সকালে বলছিলেন হজমের গোলমাল হয়েছে, পেটের মধ্যে যন্ত্রণা। শোভনাদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হবে না! এই সব যগ্যিবাড়ির ঠাকুরের রান্না কি রোজ রোজ সহ্য হয়।' সাহাদা স্ত্রীকে চেনেন। উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, আমারও শরীরটা জুৎ ঠেকে না, তুমি একটু পাতলা ঝুল রাইন্ধা দাও।' শুনে কানখাড়া করে তাকাই। ঝুল তো দেয়ালে জমে, সেটা আবার রান্না করে কি করে! মণিকা চুপিচুপি হাসে, 'তুমি বুঝি ঝুল রান্নার কথায় ভয় পাচ্ছো, ঝুল মানে ঝোল।' 'সেই কথাই তো কইতে আছি। শিম দিয়া বাগুন দিয়া পাতলা কইরা ঝুল।' সাহাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন। ভাবখানা, ভয় পেয়ো না, তোমরাও ভাগ পাবে। তা খাওয়ার ভাগে আমাদের আপত্তি নেই। রান্নার ভাগ নিতে না হলেই হ'ল। বাড়িতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ওই বাঁধা দায়টার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এখন রান্নার নামেই বিরক্তি। শোভনাদির আবার

এব্যাপারে বড় বেশী শখ। অবিলম্বে ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে গেলেন। পথের ধারে কোথায় নাকি কচি লাউ আর লকলকে শিম নিয়ে বসেছে দেখে এসেছেন। আমরা ফরাসে যে যার বিছানায় লম্বা হয়ে গল্পের আসর জমাই। কে কোথায় গেল, কি দেখল, কি কিনল—এইসব সবাইকে না জানালে তো স্বস্তি হয় না। পরদিন আবার সেইমতো যে যা দেখেনি সে সেই দিকে রওনা হয়। মণিকারা আজ গিয়েছিল কনখলের দিকে। রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষেশ্বর শিব আর আনন্দময়ী আশ্রম দেখে এসেছে। রামকৃষ্ণ মিশন আর দক্ষেশ্বরের আগে পঞ্চায়েতী আখড়ায় সন্ধ্যেবেলা বড় আসর করে ধর্মোপদেশ, আলোচনা হয়। ওদিকেও গঙ্গার শহরের পাশে পাশে প্রচুর তাঁবুর সারি। আশ্রমের শিষ্যদের জন্য কল্পবাসের ব্যবস্থা। এক আশ্রমের সামনে স্টলে কি সুন্দর স্ফটিক আর রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রি হচ্ছিল। শুনেই উঠে বসি, 'কোথায় গো, কোনদিকে?' 'কনখলের বড় রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলেই ডানহাতে দেখতে পাবে।' অনেকদিন ধরে আমার শখ একটা স্ফটিকের মালার। কতজনকে যে বলেছি। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ী বন্ধুরা বলেন, আসল স্ফটিক এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য। হরিদ্বারে এসে দেখছি পথেঘাটে রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা সাজিয়ে বসে আছে কতজন। সাহস হয় না কিনতে। দেখেই কিরকম কাঁচ কাঁচ মনে হয়। এ যখন এক আশ্রমের নাম করে বিক্রি হচ্ছে, একেবারে নিছক কাঁচ নিশ্চয়ই দেবে না। কোয়ালিটি ভালো-খারাপ হতে পারে, জিনিসটা তো ঠিকই থাকবে। মণিকা বলে, 'আশী টাকা করে একশো আটটা পাথরের মালা।' স্ফটিক ভাবলেই মনে হয় নীলকণ্ঠ মহাদেবের কণ্ঠে বিষধর কালনাগের পাশাপাশি কেমন শোভা পায় স্বচ্ছ স্ফটিকের ভূষণ। শুনে রাধা বলে, 'শুধু স্ফটিক কেন তাহলে একটা কালনাগও ঐ সঙ্গে কিনে নিয়ে এসো। সাজটা পুরোপুরি হবে।' আমি জবাব দিই না। রাধা আজকাল বড্ড বেশী কথা বলে। বিকেলে আনন্দকে অনুনয় বিনয় করে সঙ্গে নিয়ে

বেরিয়ে পড়ি। একটা রিকশা চড়ে রওনা হই কনখলের দিকে। রাস্তা যেখানে সোজা দুভাগ হয়ে গেছে সেই মোড়টা পেরোতেই সামনে পথ বন্ধ। শোভাযাত্রা আসছে। মাইকে প্রচণ্ড তালবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে চালু হিন্দী ছবির ভক্তিগীতি কানে তালা ধরিয়ে দেয়। প্রথমেই ঝলমলে রঙীন ছবি আর ব্যাটারীর আলোকমালা সাজানো কাঠের এক মস্ত উঁচু ঠেলাগাড়ি। তার সারা গায়ে গোল গোল সোনালী রং-করা পাতলা টিনের চাকতি চুমকির মতো ঝিল্‌মিল্‌ করছে। রথের মতো গাড়ির সর্বোচ্চ তলে পুরো থ্রীপীস্‌ স্যুট আর টকটকে লাল টাই পরা চুল কাঁপানো এক ছোকরা টেলিফোন-মাইক হাতে নেচে নেচে গাইছে 'জয় সন্তোষী মা।' সামনে সামনে হেঁটে চলেছে ঝক্‌মকে উর্দিপরা ব্যাণ্ডপার্টি, নিপুণভাবে রেকর্ডের 'মউজিক বাজাতে বাজাতে। কিছুদিন আগেই টি ভি.র পর্দায় জুবিন মেহতাকে দেখেছি। সামনে ব্যাণ্ডমাস্টারের জায়গায় তাঁকে দেখে চমকে গেলাম। ঠেলেঠুলে একটু কাছে এগিয়ে দেখি, না অন্য লোক। একটু বয়স্ক আর বেশী মোটা। কিন্তু সাজসজ্জা আর বিশেষ করে হাতদুটি সঞ্চালনের কায়দায় জুবিনের সঙ্গে তফাত বোঝা দুষ্কর। তফাতের মধ্যে এর হাতে ধরা রয়েছে একগোছা নোট। চলতে চলতে একটু বাদে বাদেই শোভাযাত্রা খানিকক্ষণ থেমে দাঁড়াচ্ছে। দুপাশে জমে যাওয়া পথচারীরা, এমনকি কয়েকজন গেরুয়াপরা সাধুমূর্তিও মিছিলের সামনে এসে দুআঙুলের ফাঁকে দশ-পাঁচ টাকার নোট নাড়তে নাড়তে হাত তুলে দাঁড়াচ্ছেন। ব্যাণ্ডমাস্টার গানের তালের ঝোঁকে এগিয়ে এসে সেগুলি আঙুলের ফাঁকে ধরে নিয়েই আবার তালে তালে নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। এর আগে আমি কোনো সাধুকে কোনো ব্যাণ্ডমাস্টারকে প্যালা দিতে দেখিনি। ভীড়ের মধ্যে চেপেচুপে আর একটু এগিয়ে দাঁড়াই। এরপর ঘোড়ায় টানা ছোট ছোট গাড়িতে একজন বা দুজন করে বর্ষীয়ান সাধু। ঘোড়ায় চড়ে সম্পূর্ণ নাঙ্গা সাধু। সাদা কাপড়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন

কয়েকজন মুণ্ডিতশির ব্রহ্মচারী। হাতির পিঠে সমুচ্চ ছত্রের নিচে সাজানো হাওদায় বসে এলেন কয়েকজন সাধু। এরপর সুসজ্জিত এক খোলা ল্যাণ্ডো গাড়িতে এলেন সুদর্শনা এক মহিলা। সর্বাঙ্গের একমাত্র আভরণ নাকের উজ্জ্বল হীরকবিন্দুটি এবং সুগৌর মুখাবয়ব ঘিরে পাড়হীন মহার্ঘ গেরুয়া বসনের অবগুণ্ঠন সমস্ত পটভূমিতে একটা দীপ্ত আভা দিয়েছে। চারপাশে জনতা সমস্বরে চীৎকার করে, 'জয় সন্তোষী মা!' পাশে দাঁড়ানো গৈরিকধারী এক সহাস্যমুখ বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে জানলাম ইনিই সন্তোষী মা। এঁরই নবনির্মিত আশ্রমে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে এই শোভাযাত্রার জুলুস। মায়ের বয়স দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে। প্রগাঢ়-যৌবনা মূর্তি। শহুরে সুন্দরীদের মত ক্রীম-অলিভঅয়েল মাথা মসৃণ মুখ নয়। কিন্তু উত্তর-ভারতের উন্নতনাসা উজ্জ্বল রূপে স্বাস্থ্য ও সংযতজীবন পালনের ফলে একটা রুক্ষ সৌন্দর্যের আভা এসেছে, তারপরের পুষ্পসজ্জিত অশ্বযানেও আরেকজন গৈরিকধারিণী। ইনি যোগশক্তি মা। শুনলাম ইনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। শাস্ত্রচর্চায় স্বয়ং সরস্বতীস্বরূপা। পথের দুপাশের জনতা দুহাত জোড় করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। আবার এঁরাও পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাধুদের হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তারপর আবার ব্যাণ্ডপার্টি। আবার ঘোড়া আবার হাতি। মাঝখানে কয়েকটি উট। আবার ব্যাণ্ডপার্টি আবার হাতি। এমনি করে শোভাযাত্রা চলতেই থাকল। সোনারূপায় সাজানো ঝলমলে অশ্বপৃষ্ঠে দিগম্বর সন্ন্যাসী বসে আছেন দৃপ্তভঙ্গিতে। কি আশ্চর্য সে দৃশ্য। পার্থিব বৈভবকে পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রদর্শন করে নিজে আত্মসত্তায় নিরঞ্জন থাকা—বড়ো অপরূপ এ আদর্শ। জীবনে এ মহত্ত্বকে ছুঁতে না পারি, অন্তত দূরে থেকে দেখে প্রণাম জানাবার এ সুযোগ তো এ দৃশ্য না দেখলে পেতাম না। স্ফটিকের মালা কিনে, দক্ষেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে আনন্দময়ী মায়ের সভাঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। আশ্রমে আজ রাত্রে

সাধুসমাজের ভাণ্ডারা হবে। বৃহৎ কক্ষ জুড়ে তারই আয়োজন হয়েছে। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কি পরিপাটি করে অত বড়ো ঘরটি সাজানো হয়েছে। পরিচ্ছন্ন মেঝেতে সারি সারি পিঁড়ি পাতা রয়েছে। তার সামনে ঝকঝকে রূপার মতো নতুন স্টেনলেস স্টিলের থালাবাটি সাজানো। কোনো সারিতে আবার কুশাসন। সামনে শালপাতার থালা আর মাটির গ্লাস। সম্প্রদায় বা মর্যাদা অনুসারে যে যেমন তৈজস ব্যবহার করেন, তাঁর জন্য তেমনি ব্যবস্থা। সামনে আনন্দময়ীর দেওয়াল জোড়া সহাস্য প্রতিকৃতি। যেন সাধুদের সামনে বসে খাওয়াবেন বলে অন্নপূর্ণা অপেক্ষায় বসে আছেন।

ফিরে এসে গল্প করতে অরুণদা বললেন যে, কুম্ভমেলার এ এক প্রাচীন প্রথা। মর্যাদা রাখার জন্য বড় বড় আশ্রম, আখড়া থেকে সাধুসমাজকে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। সাধারণ গৃহস্থরাও এখানে সাধুসেবার পুণ্য অর্জনের জন্য ফল-মুল-মিষ্টি-পুরী-তরকারী ইত্যাদি দিয়ে স্বেচ্ছামতো ভাণ্ডারার আয়োজন করেন। গুরুস্থানে, গুরুর আশ্রমে এসে গুরুসেবা তথা সাধুসেবা করা সংসারী মানুষের অবশ্যকর্তব্য। এক আখড়ায় ভাণ্ডারার আয়োজন দেখে প্রশ্ন করতে সাধুমহারাজ বললেন, 'গৃহস্থেরা আমাদের অর্থ দেয়। গৃহস্থের পুণ্যের জন্যই আমরা সেই অর্থের সদ্ব্যয় করি।' অর্থের সদ্ব্যয় হয় সাত উপায়ে —দেবসেবা, গোসেবা, সাধুসেবা, অতিথিসেবা. বিদ্যাদান, অন্নবস্ত্রদান ও ঔষধ দান। এই সব লোকহিতার্থে ব্যয়ও একপ্রকার কর্ম। সাধুদের কোনো কর্ম নেই। তাঁরা ভক্ত দাতাদের হয়েই এই কর্ম করেন—

বিসকা দান উসকা পুণ
যোগী অবধুতকা নেহি পাপ পুণ্।

সে কথা তো বুঝলাম। কিন্তু এই সব রকম দানের মধ্যে অন্নদানেরই যে দেখি বেশী সমারোহ। আমাদের শাস্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হয় যে

কারণে—অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির আধার যে মানবদেহ, অন্ন তারই পরিপোষক। অন্নময় কোষকে অবলম্বন করে ক্রমান্বয়ে মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষের অবস্থান। এই বিজ্ঞানময় কোষকে অবলম্বন করে আনন্দময় কোষ- যেখানে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত জীবাত্মার অবস্থান। অন্নদানে এবং গ্রহণে সেকথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এজন্যই শাস্ত্রে অন্নগ্রহণের ব্যাপারে এত বিধিনিষেধ। শুদ্ধান্ন গ্রহণের এত প্রশংসা। বিষয়ীর অন্নের নিহিত কামনা বাসনার বিষ সাধুর রক্তের মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্য এত সতর্কতা। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ। নিবেদন মন্ত্রে অন্নকে এজন্য 'ব্রহ্মহবি' বলা হয়েছে—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণো হুতম্।
ব্রহ্মৈব তে ন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

সাধুরা ভাণ্ডারা দেন এই ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মার্পণের মনোভাব নিয়ে। এজন্য কুম্ভের শোভাযাত্রার মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাণ্ডারারও বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। কোন্ আখড়া কবে, কতজনকে ভাণ্ডারায় আমন্ত্রণ জানাবে, কারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন এই সবই সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। এর ফলে কুম্ভের এই বিশাল যজ্ঞে সাধুসমাজের অন্নের অভাব হ'ত না। এবারে অবশ্য প্রধান ভাণ্ডারার ভার নিয়েছেন সরকারপক্ষ দিনের মধ্যে দুবার সরকারী উদ্যোগে সাধুদের আবাসে গিয়ে কর্মীরা তাঁদের আহার্য দিয়ে আসছেন। খিচুড়ী, পুরী ও তরকারী। চমৎকার। অন্নচিন্তা পরিহার করে সাধুরা যাতে এ ক'দিন আশ্রমোচিত কর্মে একাগ্র থাকতে পারেন, সেজন্য কুম্ভমেলায় এ ব্যবস্থা খুবই সমীচীন হয়েছে।

আট

আজ এপ্রিলের তেরঃ তারিখ। রাত দুটোর পর থেকে শুরু হবে অমৃতকুম্ভযোগের পুণ্যস্নান। কাল বিকেল থেকেই হরিদ্বার শহরের

চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মৌনী অমাবস্যার স্নানের পর আলগা ভিড়টা একটু কমে গিয়েছিল। কাছাকাছি থেকে আসা অনেকে স্নানান্তে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। দূরের অনেকে আবার এই ফাঁকে চটকরে কাশী-বৃন্দাবন দর্শন সেরে এলেন। অর্থাৎ পুণ্যের খাতায় খানিকটা ফাউ জমা পড়ল। আজ সকাল থেকেই আবার জোয়ারের মতো হুহু করে লোক এসে পড়ছে। রেলপথে, বাসে, ট্যাক্সিতে, টাঙ্গায়, হেঁটে শহরের চতুঃসীমা দিয়ে অনবরত প্রবেশ করছে অসংখ্য মানুষ। থাকার জায়গা অধিকাংশেরই নেই। রাস্তার ধারে, সিঁড়ির কোটরে, ব্রীজের নিচে, উন্মুক্ত চত্বায় যথেচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে আছে তারা। পথের পাশে কম্বল বিছিয়ে বসে সঙ্গে আনা যৎসামান্য আটা আর বেসনের শুকনো খাদ্য গলাধঃকরণ করে কপাল পর্যন্ত কম্বলটা টেনে নিয়ে অক্লেশে শুয়ে পড়ছে। অশক্ত বৃদ্ধ থেকে ক'মাসের শিশু কোলে যুবতী—সকলেই আছে সেই দলে। কিন্তু বাঙালী নেই একজনও। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যে বাঙালী তীর্থভ্রমণ করে, প্রমোদভ্রমণ তো আরও বেশী করে। কিন্তু অব্যবস্থায় ভ্রমণ করে না। দুদিনের জন্য কষ্ট আর এমন কি—এ তাদের মত নয়। দুদিনের জন্য এসেছি, কষ্ট কেন করব—এই বাঙালীর মটো। দুচারজন উৎসাহী যুবক হয়তো আনশ্চিতের তাড়নায় বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পরিবার নিয়ে কোনো বাঙালী এরকম পথে রাত কাটানোর ভরসায় আসবে না। অথচ উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থানের অসংখ্য সম্পন্ন গৃহিণীকে পথের ধারে এরকম সাবলীলভাবে অবস্থান করতে দেখেছি, শুধু এই কুম্ভমেলাতে নয়, সব মেলাতেই। যেন এটাই স্বাভাবিক, তীর্থে এতো করতেই হবে। এ ব্যাপারে যে আবার চিন্তার কিছু আছে তাই তাদের চিন্তায় আসে না। হয়তো বাঙালীর শারীরিক সবলতার অভাবই এর কারণ। আগেপিছে এত ভাবনার কারণ তার অল্পেই অসুবিধা হয়, সহজেই অসুখ। এজন্য কুম্ভমেলায় বাঙালী

অনেক এলেও তারা শহরের কয়েকটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এদিকে হৃষীকেশ বা তারও ওধারে মুনি-কি-রেতি থেকে ওদিকে জ্বালাপুর পর্যন্ত যে অসংখ্য উপনিবেশ গজিয়ে উঠেছে সেখানে শুধু উত্তর ভারতীয়দেরই ভিড়। আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তুলনায় দক্ষিণ ভারতীয় খুব কমই চোখে পড়ে। পশ্চিম ভারতের অবশ্য অনেক মানুষ এসেছেন। কিন্তু তাঁরা কতটা সুদূর পশ্চিমাঞ্চল থেকে—আর কতজন ব্যবসাসূত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী তা বলা মুশকিল। আর এই অসংখ্য মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এসেছে অজস্র পণ্যের পসরা। সাধুর সঙ্গে ভক্ত, পসারীর সঙ্গে পকেটমার বিভিন্নমুখী চরিত্রের সমাবেশে জমে উঠেছে মেলা।

আমাদের খাওয়া-শোওয়া সবকিছু স্পেশালের দায়িত্বে। সারাদিন নির্ভাবনায় চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখছি আর সময়মতো ডেরায় ফিরে নিয়মিত আহার-বিশ্রাম করছি। অর্থাৎ মেলার পুরো মজাটা আছে, দুর্ভোগটা নেই। একটা বয়সে এই দুর্ভোগেও মজা লাগে। সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি বলেই এই স্পেশালের আশ্রয় নেওয়া। তার ফলে উপরিলাভ হয়েছে, এতরকমের এতগুলি লোকের সঙ্গে এত কাছাকাছি খাওয়া-শোওয়া করে জীবনের এত বিচিত্র রূপ দেখে নেওয়া। এই গায়ে গায়ে গদি সাজানো মস্ত ঘরে সকলে মিলে গড়ে উঠেছে যে বিরাট সংসার তার বিচিত্র হৃদ্স্পন্দনের মধ্যে নিজের বুকের ধ্বনিটাও অন্যরকম লাগে। জীবনকে সাজিয়ে দেখার খুশী নয়, খুলে দেখার, মেলে দেখানোর খেলা এখানে। সুরের সঙ্গে বেসুর তাই বড়ো সহজে মিলে যায়। মিলে মিশে হয়ে ওঠে আরেক নতুন সুর। কলকাতার সাজানো সংসারে যার সন্ধান পাইনি কখনো। সেই সুর জমে উঠবে আজ মধ্যরাতে। সকাল থেকেই তাই মনের মধ্যে সাজসাজ রব। সকাল থেকেই দেখছি বহুলোক স্নান সেরে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুখ্যযোগের লগ্ন শুরুর

আগেই প্রাণসংশয় ভিড়টা এড়িয়ে চলে যাচ্ছে তারা। দেখছি আর ভাবছি এত লোক যখন চলে যাচ্ছে তখন সে সময় ভিড়টা তাহলে একটু কম হবে। ভারত সেবাশ্রমে সাধুসমাবেশ দর্শন করতে গিয়েছিলাম গতকাল সন্ধ্যায়। যোগের সঠিক লগ্ন, সাধু এবং গৃহস্থদের স্নানের নির্ধারিত সময় ইত্যাদি সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাত দুটো কুড়ি থেকে অমৃতকুম্ভযোগ শুরু হচ্ছে। তারপর সকাল দশটা কুড়ি পর্যন্ত ব্রহ্মকুণ্ডে সাধারণ স্নানার্থীরা স্নান করতে পারবেন। তারপর সন্ন্যাসীরা স্নান করবেন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ব্রহ্মকুণ্ড বাদ দিয়ে অন্যান্য ঘাটে অবশ্য সকলেই সবসময় স্নান করতে পারেন। ঠিক হল আমরা ঠিক রাত দুটো কুড়িতেই ব্রহ্মকুণ্ডে যাবো। নিজেদের স্নানপর্ব চুকিয়ে এসে তারপর সাধুদের শোভাযাত্রা ও স্নান দর্শন করা যাবে। কুম্ভযোগে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে যাবো ভাবতেই সসম্ভ্রম বিস্ময়ে ভরে ওঠে মন। স্মরণাতীত কাল থেকে এই যোগে অবগাহন করেছেন কত সাধুসন্ত, কত ভক্তজন। সেই অবিচ্ছিন্ন ভক্তিধারার স্পর্শ যেন মনে এসে লাগে। দেবী পার্বতী একবার শিবকে প্রশ্ন করেছিলেন; এই যে গঙ্গা কুম্ভযোগে হরিদ্বারে প্রবাহিতা হচ্ছেন—তাতে কত অসংখ্য পাপীতাপী স্নান করে পরামুক্তি লাভ করছে। এর ফলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য বজায় থাকবে কি করে! মহাদেব উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, সকলেই স্নান করছে বটে কিন্তু যার যথার্থ ভক্তি আছে শুধু সেই মুক্তি লাভ করবে। যথার্থ ভক্তি ছাড়া তীর্থের মহিমা জাগ্রত হয় না। প্রকৃতপক্ষে কতজনের মনে সেই ভক্তি আছে দেবীকে তা দেখানোর জন্য ভোলানাথ তখন স্নানঘাটের সামনে এক কুষ্ঠরোগীর শবদেহরূপ ধারণ করে শায়িত হলেন। আর পার্বতী অসহায়া বৃদ্ধা বিধবারূপে সেই শব ক্রোড়ে নিয়ে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন। যত সাধু-তপস্বী স্নানার্থী সকলেই সন্তর্পণে শবদেহ এড়িয়ে চলে গেলেন। শেষে এক দুশ্চরিত্র মদ্যপ এসে উপস্থিত

হ'ল। পুণ্যস্নানের কোন অভিসন্ধিই তার নেই। পঞ্চমকারের প্রথমটি সযত্নে হস্তগত করে সে চলেছে শেষের বস্তুটির সন্ধানে। পার্বতীর আর্ত ক্রন্দনে বিগলিত হয়ে সে বললো, 'এই বুড়ী, বৃথা আর কেঁদে কি হবে। তোর স্বামী তো মরেই গেছে। ওকে এবার শ্মশানে নিয়ে দাহ করে ফ্যাল্।'

পার্বতী বললেন, 'এই গলিত শবদেহ বহন করে নেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই বাবা, তাই বসে বসে কাঁদছি।'

'আচ্ছা, তুই এখন কান্না থামা, আমিই একে নিয়ে যাচ্ছি।'

পার্বতী বললেন, 'তা কি করে হয় বাবা। এ মহাপাপী মারা গেছে কুষ্ঠরোগে। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নয় এমন কেউ যদি এই শবদেহ স্পর্শ করে, সেই পাপসঞ্জাত মহাব্যাধি যে তৎক্ষণাৎ তাকেই আশ্রয় করবে।'

'ও এই কথা' লোকটি হেসে উঠলো। 'আমি অবশ্য সর্ববিধ পাপই এ জীবনে করেছি। কিন্তু ঐ তো সামনে রয়েছে গঙ্গা, কুম্ভযোগের গঙ্গা। আমি এক্ষুনি ডুব দিয়ে সর্বপাপমুক্ত হয়ে আসছি। তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দেবো।' গঙ্গায় একটি ডুব দিয়ে এসে সে নিঃসঙ্কোচ কুষ্ঠরোগীর সেই গলিত মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিলো।

তখন মহেশ্বর স্বরূপ পরিগ্রহ করে পার্বতীকে বললেন, 'দেবি, আজকের কুম্ভপর্বের অসংখ্য স্নানার্থীর মধ্যে একমাত্র এই লোকটিই তার সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত হয়েছে। কারণ একমাত্র সে-ই-সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছে এই মহাযোগের মাহাত্ম্য।

শোভনাদির বাবার মুখে গল্প শুনতে শুনতে ভাবছিলাম এই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের জোর তো আমাদের নেই। তাহলে আমাদের কুম্ভস্নানের ফল কি! এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে এসে শুধু কি জলস্রোতে অবগাহনই আমার মতো সংশয়ীদের সার হবে! আরতিদি হেসে বললেন, 'আমাদের সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস নেই সত্যি। কিন্তু ঐ ভক্তিতে,

বিশ্বাসে তো ভক্তি আছে। সেজন্য তার এইটুকু ভগ্নাংশ ফল আমাদের পাওনা।'

'সে আবার কেমন কথা'—অবাক হয়ে তাকাই। 'ওই ভক্তির কথা শুনে যেমন কান জুড়ালো, তেমনি মন জুড়িয়ে যাবে সেই ভক্তির আশ্রয় গঙ্গায় ডুব দিয়ে।' ঠিকই তো। এই কথাটাই এতক্ষণ ভুলে বসেছিলাম। আমি তো পাপমোচন করতে আসিনি। এসেছি প্রাণ জুড়োতে। রাধার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। এ ক'দিন ওর মুখে চোখে যে একটা অতৃপ্তির প্রচ্ছন্ন ছায়া দুলছিল, আজ তা একেবারেই সরে গেছে। বাইরের বেলা দশটার আকাশের মতোই ঝলমলে মুখে রাধা বললো, 'চলো আরতিদি সকলে মিলে তাহলে সকাবেলাই একটা অ্যাডভান্স ডুব দিয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে আসি।'

তাতো দেবই, কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে নয়। সেখানে ভিড়ের যে আন্দাজটা পাচ্ছি, তাতে সমস্তটা এনার্জি রাত্রের জন্য স্টোর করে রাখাই ভালো। সকলে মিলে জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভোলাগিরির ঘাটের দিকে। সেখানেও আজ বেশ ভিড় হয়েছে। মানুষের সারিতে জলের ধারে সিঁড়ির ধাপ দেখা যায় না। কোনোমতে একপাশ দিয়ে জলে নামি। তীব্র খরস্রোত আজ আর নেই। অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য সকাল থেকেই লকগেট আটকে জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ করে রাখা হয়েছে। স্নান করে অনেকেই ফুল, ফল, পয়সা ছুঁড়ে ফেলছে গঙ্গায়। একদল স্থানীয় শিশু কিশোর সেগুলি কুড়োতে ব্যস্ত। অনায়াসে একেবারে মাঝখানে চলে গিয়ে হাতড়ে তুলে আনছে। জল গভীর নয় জানি, আজ স্রোতও তত নেই। তবু শিকল ধরেই আমরা স্নান সারি। সবাই সাবধান, আজ সবব্যাপারেই সাবধান। আজ মধ্যরাত্রে যে মহাপর্ব আসছে তার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোনো ব্রত-পূজার আগের দিন সংযত হয়ে ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করাই বিধি। সত্যিকার আগ্রহ থাকলে উৎকণ্ঠায় এ

বিধি আপনা থেকেই পালিত হয়ে যায়। আজ সকাল থেকে আমাদের মনে মনে সেই এক চিন্তা। মুখে মুখে শুধু সেই কান্থু বই আর গীত নেই।

আজ নীলপুজোর উপবাস। অনেকেই শিবের মাথায় জল দিয়ে এসে দুপুরে শুধু ফলাহার করবেন। বাণীদির স্পেশালের থালায় সাজিয়ে দেওয়া ফলে ভক্তি নেই। কে জানে কোথায় ছোঁয়াছ্যাপা করে সর্বস্ব এঁটো করে রেখেছে ওরা। স্নান করে ফেরার পথে বাজারে গিয়ে নিজেই ফল কিনলেন। আম, কলা পেয়ারা, শসা আর বেল। সবই দুপ্রস্থ করে। একপ্রস্থ নীলের ভোগ। আবার যোগের সময় গঙ্গায় স্নান করে পাঁচরকম ফল উৎসর্গ করবেন। গঙ্গাবক্ষে অবগাহনঅন্তে পূবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে ফল ও পয়সা নিয়ে মাস, তিথি, নামগোত্র উল্লেখ করে গঙ্গাকে উৎসর্গ করতে হবে।

'পয়সা কেন?'

'দক্ষিণা দিতে হবে না? দক্ষিণা ছাড়া পূজা সিদ্ধ হয় না জান না?'

'কিন্তু সে'ত পুরোহিত থাকলে। এখানে মা গঙ্গা পয়সা নিয়ে কি করবেন, সে'ত তক্ষুনি কুড়িয়ে নেবে ঐ দুষ্টু ছেলেগুলো।'

'ওরাই তো গঙ্গাপুত্র। ওদের দক্ষিণা দিলেই মা গঙ্গা প্রসন্ন হবেন। বাজে কথা রেখে এবার শুনে নাও গঙ্গার ধ্যান :-

ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাংস্ত শ্বেতাচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং বেদাদিভিরভিষ্টুতাম্॥

তারপর পূজামন্ত্র—

ওঁ গঙ্গায়ৈঃ বিশ্বমুখায়ৈ শিবামৃতায়ৈ
শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।

শেষে প্রণাম—

সম্বপাতকসংহন্ত্রী সন্ত দুঃখ বিনাশিনী
সুখদামোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি ॥

'আচ্ছা, গঙ্গার এত মন্ত্র আছে, কুম্ভের নেই?'

'কুম্ভের আবার মন্ত্র কি, জাননা কুম্ভ পূর্ণ হলে আর শব্দ নেই। তখন নুনের পুতুল সাগরে। চিনি হয়ে গেলে কি আর চিনির স্বাদ বর্ণনা করা যায়?'

আরতিদির কথায় একটু কবিত্ব থাকবেই। বাণীদি এসবের মধ্যে নেই। গম্ভীরভাবে স্নানের সব সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখেন। আজ দুপুরে বিছানায় পড়ে থেকেও কারো চোখে ঘুম নেই। সকলেই উৎকণ্ঠায় আছি কখন সন্ধ্যা হবে, তারপর রাত্রি হবে, আসবে সেই পরমলগ্ন। কি জানি সকলে ওই ভিড় ঠেলে ঠিকমতো ডুব দিয়ে উঠে আসতে পারব তো? আসার সময় কতজন যে বলে দিয়েছেন তাঁদের নামে একটা করে ডুব দিতে। হরি ভোরবেলাই বাজারে গেছে সকলের জন্য গঙ্গাজলের পাত্র কিনতে। এখানে এসে মনে হচ্ছে সঙ্গে নিয়ে আসা ছোট্ট বোতলে কতটুকু জলই বা আঁটবে। কেউ দু-সেরী কেউ পাঁচ-সেরী প্লাসটিকের বোতল—অরুণদা তো পুরো দশ-সেরী ক্যান্ আনতে বলে দিয়েছেন। বিকেল গাড়িয়ে সে ফিরলো শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে। ভিড় সামলাতে সারা শহরের সমস্ত রাস্তাই ওয়ান-ওয়ে করে দেওয়া হয়েছে। আধমাইল দূরের বাজারে যাতায়াতে বেচারীকে হাঁটতে হয়েছে পাক্কা পাঁচ পাঁচ দশ মাইল। আর সেই একমুখী রাস্তাতেও নাকি ভিড়ের এমনই প্রচণ্ড চাপ যে হরির মতো জোয়ান লোকেরও দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। শুনে মনে মনে প্রমাদ গুণি। রেণুদি তো উৎকণ্ঠায় সকাল থেকেই ঘন ঘন বড় বাইরের দিকে যাচ্ছেন। বিকেল নাগাদ একেবারেই শুয়ে পড়লেন। আবার সঙ্কোচে কাউকে জানাতেও দেবেন না। শেষে আরতিদি আর কোনো কথা না শুনে অরুণদাকে এঘরে ডেকে

আনলেন। ওষুধ দেওয়া হল—শারীরিক মানসিক দুরকমেরই অস্বস্তি যাতে কমে। শোভনাদিরা আবার চাল ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে পোঁটলা করে নিচ্ছেন। এই ভিড়ের মধ্যে আবার ওইসব দান গ্রহণ করার লোক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে জানি না। ব্যস্ত রাধাও। কি পরে চান করবে. তারপরেই বা কি পরবে, অতলোকের মধ্যে কেমন করেই বা পরবে—কতরকম যে সমস্যা। মণিকার আবার আরো সমস্যা চিরুনী নেবে কিনা, লিপস্টিক আর আয়না ইত্যাদি।

হেসে বলি, 'তখন আর কে কি পরল, কি সাজল কেউ চেয়ে দেখবে না ; আর সাজা তো সর্বদা পরের জন্যই। কাজেই এখানে নিশ্চিন্তে যা খুশী পরে যা খুশী করে চলে আসিস্।'

সত্যি, এ ক'দিন গঙ্গার ঘাটে নানাপ্রদেশের নানারুচির মহিলাকুলের স্নানপর্ব দেখতে দেখতে আমারও চোখ খুলে গেছে। ছেলেবেলায় স্কুলের রচনায় মুখস্থ করেছিলাম যে দেশভ্রমণে সংস্কার দূর হয়, মনের প্রসারতা বাড়ে। আমার মনে হয় সমগ্র উত্তরভারতীয় মহিলারাই বোধহয় স্নানের ঘাটে সংস্কারহীন জাপানী ঐতিহ্যের অনুরাগী। চুড়িদার-কুর্তার নিচের অংশটি খুলে রেখে অথবা নিছক পেটিকোটটি বুকে বেঁধে কি অনায়াসে তারা জলে নেমে যান। আমাদের বাঙালী মেয়েদের চোখের সামনে সে দৃশ্য দেখে লজ্জা করবার জন্যই লজ্জা পেতে হয়। মনে আছে অমরনাথের রাস্তায় পাঁচদিনের হাঁটাপথে নারীপুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যখন প্রায় মুখোমুখি প্রাতঃকৃত্যে বসত, সে দৃশ্য দেখে আমার খুবই সঙ্কোচ বোধ হ'ত। এক বর্ষীয়সী পাঞ্জাবিনী ধমকে দিয়ে বললেন, 'লজ্জা আবার কাকে ? মনে করবে চারপাশের কেউই মানুষ নয়।' হায়রে, মনকে এরকম ইচ্ছে মতন মনে করানোর অলৌকিক ক্ষমতা থাকলে আর আমার ভাবনা ছিল কি। শেষে বোধহয় আমার করুণ মুখ দেখে ভদ্রমহিলার দয়া হ'ল। তখন আর একটা উপায় বাতলালেন, 'ঘোমটায় মুখ ঢেকে বস, পেছনটা দেখে তো আর কেউ তোমায়

চিনতে পারবে না।' যুক্তি অকাট্য। এজন্যই তো খুনীরা মৃতদেহের মাথাটা কেটে লোপাট করে ফেলে। আমি অবশ্য ঘোমটার আড়ালে পরিচয় ঢাকার বদলে শেষে বুদ্ধি করে এক সহযাত্রীর ছাতাটা ধার নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে তো ছাতায় লজ্জা রক্ষা করা যাবে না। চারদিকে তাহলে চারটে ছাতা লাগবে। আর চারজন লোক লাগবে সেগুলি ধরে থাকতে। তাছাড়া চারটে কেন, এই জমাট ভিড়ের মধ্যে একটা ছাতা খুললেই সেই ছাতা দিয়েই যে লোকে আমাকে পেটাবে তাতে সন্দেহ নেই। মজা হচ্ছে এই যে, এই লজ্জা লজ্জা রকমটার জন্যই লোকে আমাদের বেশী করে তাকিয়ে দেখে। এতদিন ধরে রোজ যে দুবেলা ঘাটে ঘাটে স্নান করছি, মাত্র একদিন একটি ঘটনা চোখে পড়েছিল। দুই উৎসাহী যুবক গঙ্গার দৃশ্যের পটভূমি হিসেবে এক যুবতীর বেশপরিবর্তনকে ক্যামেরায় ধরতে চেষ্টা করছিল। যুবতীর সঙ্গীরা এবং অন্য স্নানার্থীদের তৎপরতায় যুবকদের অবশ্য অবিলম্বে ক্যামেরা গুটিয়ে স্থানত্যাগ করতে হ'ল। কিন্তু আমার মনটা বিকল হয়ে গেল এই কারণে যে ঐ যুবতী এবং যুবক দুজন —দুপক্ষই ছিল নির্ভেজাল বাঙালী। যুবতীর সঙ্কোচই যেমন যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তেমনি এত লোকের মধ্যে ঐ দুজনই যে দৃষ্টিতে দূরবীন লাগিয়ে ঘুরছিল এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। যতই আমরা মনে করি না কেন যে মন থেকে প্রাদেশিকতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পেরেছি, এধরনের আকস্মিক খোঁচায় অহংবোধের নুনছালটা উঠে গিয়ে মনের তলাকার স্পর্শকাতর অংশটা বড় সংকুচিত, লজ্জিত হয়ে ওঠে।

নয়

প্রতীক্ষার কাল নাকি দীর্ঘ লাগে। সে হয় একা হ'লে। সকলে মিলে একথা-ওকথায় কি তাড়াতাড়ি মাঝরাত হয়ে গেল আজ।

সকালে হরির দুর্ভোগ দেখে সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি দেখতেও যাইনি। কি জানি রাস্তা কোথা থেকে কোথায় ঘুরিয়ে দেবে। শেষে হয়তো সময়ে ফিরতে পারবো না। আজ আমরা সবাই সময়নিষ্ঠায় ইংরেজ। বার বার ঘড়ি মেলাচ্ছি। ইরাদির ট্রানজিস্টারটা সন্ধ্যা থেকেই চালানো আছে। প্রত্যেকবার খবরের সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ইরাদিকে কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই দেখছি না। বিকেলে যথারীতি প্রসাধন ও পরিধান পরিবর্তন করে একলাই নিচে নেমে গেলেন। রাত দশটা বাজতে চললো এখনো দেখা নেই। ভদ্রমহিলার নাকি আবার হার্টের গোলমাল আছে। হার্টে কোনো গোলমাল হলে অবশ্য অরুণদা আছেন। গোলমালটা হৃদয়ঘটিত হলেই মুশকিল। আমাদের চিন্তিত দেখে মণিকা একবার ওরকম একটু যেন ইঙ্গিত করল। আমরা অবশ্য সে কথায় কান দিই না। তবু চিন্তা তো একটু হয়ই। অবশেষে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ইরাদি ফিরলেন। গাঢ় খয়েরী গার্ডেন শাড়ির আঁচল সামলে একমুখ উজ্জ্বল হেসে বললেন, 'স্যরি, তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকা হচ্ছে না। আজই আমি ফিরে যাব।'

'ফিরে যাবেন। তার মানে?'

'কোথায় যাবেন?'

'কেন?'

'কি করে?'

এ ক'দিনের পরিচয়ে ইরাদির নানারকম অভাবিত ক্রিয়াকলাপে অবশ্য আমরা খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারটা হজম করা সত্যি মুশকিল। কাল সন্ধ্যায় চারটে কম্বল আর দুটো শাল কিনে এনে দেখাতে দেখাতে বলেছেন যে আরও অন্তত দুটো কম্বল কিনতেই হবে। হরিকে সকালে জলের জার আনতে দেবার সময় বলে রেখেছেন, যোগের ভিড়ে তিনি জল ভরতে না পারলে হরি যেন সেটা ভরে দেয়। কলকাতায় গিয়ে কর্তার মাথায় দিতে হবে।

তাছাড়া পরশু মুসৌরী যাবার জন্য ট্যাক্সি ঠিক আছে। তারপরের দিন হৃষীকেশ। তাহলে হঠাৎ আবার এ মতি কেন। আর তাছাড়া কতরাতে, কখন যে স্নান শেষ করে ফেরা যাবে তারও তো ঠিক নেই। তারপর আর যাবেন কখন। ইরাদি ততক্ষণে ক্ষিপ্রহাতে স্যুটকেস, ব্যাগ গোছাচ্ছেন। আরতিদির প্রশ্নের উত্তরে পরিতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে বলেন, 'না, আমি আর তোমাদের সঙ্গে স্নান করতে যাচ্ছি না। মণিকা, তুমি ভাই আমার জলটা ভরে নিয়ে নিও। আমি ক্লাবে তোমার থেকে নিয়ে নেবো।'

স্নান করবেন না। কুম্ভস্নানের জন্য এতদূর থেকে এসে, প্রায় সপ্তাহখানেক সেজন্য অপেক্ষায় বসে থেকে, কম্বল কিনে, কাঁচের চুড়ি, আচার আর পেতলের বাসনের প্রায় একটা দোকান সাজানোর মতো সওদা করে এখন বলছেন স্নান করবেন না। ঠিক শুনছি তো, নাকি উত্তেজনায় আমারই মাথার গোলমাল হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি ঘরশুদ্ধ সকলেরই আমার মতোই হতভম্ব অবস্থা। কেবল সুবলবাবু কিছুতেই অবাক হন না। ধীরগলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আপনার এতগুলো মাল ? আজ তো কোনো কুলী পাওয়া যাবে না।'

'মাল। ওঃ, ওগুলো এখানেই থাক। তুমি ভাই কলকাতায় গিয়ে একটা ফোন করো, আমি তোমাদের অফিস থেকে আনিয়ে নেবো।'

'তা, যাচ্ছেন কিভাবে ?' অরুণদার গলা অত্যন্ত সংহত।

'ওঃ, এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে আজ বিকেলেই দিল্লী থেকে এসেছে। ওদের সঙ্গে রাত্রেই দিল্লী ফিরে যাব। কাল দিনটা হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে রাতের ফ্লাইটে কলকাতা।'

'তা বন্ধুটি তো এখানে স্নান করতেই এসেছেন ?' অরুণদার গলা আরো মসৃণ।

'সেই তো হয়েছে মুশকিল। এই ভিড়ের মধ্যে স্নান ও করবেই। তারপর যে কখন ফিরবে, কখন যাব কোনো ঠিক নেই। তাই আমি

আর আপনাদের সঙ্গে যাব না—কি জানি, ও যদি এরমধ্যে এসে ফিরে যায়!'

আমাদের সঙ্গে না যান, সেই বন্ধুর সঙ্গে গিয়েও তো স্নানটা সেরে নিতে পারতেন। আমি আর সাহস করে কথাটা বলি না। রাধা হঠাৎ পাশ থেকে বলে ওঠে, 'এ ক'দিন একসঙ্গে রইলাম, হঠাৎ চলে যাচ্ছেন, বড় খারাপ লাগছে।'

'কি করি বল। পয়লা বৈশাখ সকালে আমাদের ক্লাবে ফাংশান। শেষের কবিতায় আমি লাবণ্য সাজব।'

'ওঃ লাবণ্য! কি চমৎকার হবে।' রাধার উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। ইরাদির নাতি সাউথ পয়েণ্টে আমার মেয়ের সহপাঠী। ইচ্ছে থাকলেও এই সহজ কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারি না যে, তাহলে এযাত্রায় এসেছিলেন কেন! আমাদের ফেরার কথা তো আরো সাতদিন পরে। নাকি এই আকস্মিক যাত্রাভঙ্গ—এভাবে এসে আবার ওভাবে যাওয়া, এসবই পূর্বপরিকল্পিত। যেমন রূপালীপর্দার গল্পে দেখানো আকস্মিক ঘটনাগুলি অনেক তোড়জোড়, অনেক পরিকল্পনামাফিকই আকস্মিকভাবে ঘটানো হয়। যাইহোক, এখন আর বসে বসে এসব চিন্তা করার সময় নেই।

বাণীদি ওদিকে মহাব্যস্ত হয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছেন—'বারোটা বাজতে চলল, এখনও তোমরা বসে আছো। কতপথ ঘুরে হেঁটে যেতে হবে সে খেয়াল আছে?' তাড়াতাড়ি সকলে জিনিসপত্র গোছাতে থাকেন। কেউ সঙ্গে এনেছেন স্বামীর চিতাভস্ম, কেউ বা শিশু নাতির মাথার জন্মচুল। সোনা, রূপা, নববস্ত্র, ফুল, ফল—পোঁটলার আর শেষ নেই। তবে এসব জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে দেবার উপায় নেই হরিদ্বারে। কাশীতে দেখেছি ছটপরবের সময় গঙ্গাপূজা হয়। নৌকা করে গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত শাড়ী, প্রদীপ, ফুলের মালা বিছিয়ে দেওয়া হয়। ঢেউয়ের দোলায় ভেসে ভেসে সে যে কি অপরূপ সুন্দর দৃশ্য হয়, না দেখলে কল্পনা করা

যায় না। আর এখানে গঙ্গার ঢেউয়ের শৈশবের চঞ্চল পাগলামি। নৌকা করে শাড়ী পরানোর তো প্রশ্নই নেই। ফুল-প্রদীপের ডালি তীব্র স্রোতে মুহূর্তে ভেসে, ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নদী এখানে পার্বতী তাপসী। সুকঠিন পাথরে অবিরাম মাথা কুটে কুটে চলেছে। সাজসজ্জার কোন প্রশ্নই নেই।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এতক্ষণে বেশ শীত করছে। এখানে এসে প্রথম রাত্রিটা ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়ে দ্বিতীয় দিনই একটা বড় গরম চাদর কিনে নিয়েছি। প্রয়োজনে গায়ে জড়িয়ে বেরোনোও যায় আবার মাথাকান ঢেকে শোওয়াও চলে। সেইটা মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাও তো এটা এপ্রিল মাস। কলকাতায় লোকে এখন শেষচৈত্রের গরমে আইঢাই করছে। এর আগের পূর্ণকুম্ভ হয়ে ছিল এলাহাবাদে। মাঘ মাসের তীব্র শীতে। সেবারে কুম্ভের কথায় আমি বলেছিলাম, 'এই পশ্চিমের ঠাণ্ডায় সঙ্গমে স্নান করে আমি নিউমোনিয়া বাঁধাতে রাজী নই।' আনন্দ বলেছিলেন, 'তোমাকে নাহয় সঙ্গম থেকে বালতি করে জল তুলে এনে গরম করে দেব।' চৈত্রের শীতে হাঁটতে হাঁটতে সে কথাটা হঠাৎ এতদিন পরে মনে পড়ল।

রাস্তায় নেমেই একেবারে জনসমুদ্রের আবর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম। অসংখ্য লোক এই মাঝরাতের রাস্তা একেবারে ভর্তি করে চলছে। তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত ভিড়ে পূজার সময় মধ্যরাতের কলকাতাকে মনে পড়ে। অর্থাৎ এখানেও আমাদের মতন বুদ্ধিমান লোক প্রচুর আছে। মাঝরাতে ভিড় এড়ানোর আশায় ভিড় বাড়িয়ে চলছে। চলতে চলতে ভোলাগিরির ঘাটের পাশের সেতু দিয়ে ওপারে চলে যেতে হ'ল। সেখানে কাঁচা রাস্তা কাদা বালিতে একেবারে থিকথিক করছে। তার মধ্যেই বোঁচকা-বুঁচকি বিছিয়ে বসে আছে কতলোক। চারদিকে বাঁশের বেড়ায় নির্দিষ্ট যাওয়া

আসার কত পথ। সব পথেই মানুষ। ঘুরে ঘুরে এমন ভাবেই পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনটা আসা কোনটা যাওয়ার ঠিক খেই পাওয়া যায় না যেন। অন্ধের মতো সামনের মানুষদের পিছু পিছু প্রায় দৌড়ে চলেছি। ভিড় যত বাড়ছে তত বাড়ছে পায়ে চলার গতি। সবাই এমন এগিয়ে যাওয়ার নিঃশব্দ প্রতিযোগিতায় মেতেছে, তাল রাখতে দৌড়নো ছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ একটা কবন্ধ জন্তুর দীর্ঘশ্বাসের মতো বিচিত্রগন্ধী গাঢ় ধোঁয়া ছড়িয়ে হুড়মুড় করে পাশ দিয়ে চলে গেল বিকটদর্শন এক অতিকায় কালো গাড়ি। এ কী ব্যাপার—সভয়ে নাক চেপে সরে দাঁড়াই। শুনি এগুলি কীট-পতঙ্গ-বীজাণু ধ্বংস করার গ্যাস। অর্থাৎ বেগন স্প্রে কিংবা কচ্ছপ ছাপ ধূপের ম্যাগনাম সংস্করণ বলা যায়। মাঝরাতের নিরিবিলি প্রহরে ওষুধ ছড়াতে বেরিয়েছে। হায়, মাঝরাতেই যে বরং ভরা দিনের ভিড়। এগোতে এগোতে ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। আশপাশের নানা অলিগলি দিয়ে জনস্রোত এসে যোগ দিচ্ছে মূল স্রোতে। হঠাৎ সামনে একটা বাঁশের আগড়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পথের মাঝে মাঝে এমনি বাঁধ দিয়ে রাখা হয়েছে। সামনের পথ খালি হলে তখন পিছনের লোককে এগোতে দেওয়া হবে। নইলে পিছনের মানুষের চাপে নদীর ঘাটে আছড়ে পড়বে মানুষ। তাড়াতাড়ি বালুর ওপর দিয়ে চলতে একপাটি চটি পা থেকে খুলে গেল। মুখ নীচু করে দেখতে যেতেই বেসামাল পিছনের লোকের ধাক্কা খেলাম। তাড়াতাড়ি পাশের লোকের হাত ধরে টাল সামলাই। এইরকম ভিড়ে বেমকা ধাকায় হঠাৎ পড়ে গেলে আর ওঠার উপায় থাকে না। পিছনে আসা জনতার পায়ের চাপে মুহূর্তে দলিত হয়ে যেতে হয়। পিছনের লোকেরও উপায় থাকে না সাহায্য করার—নীচু হলেই ঘাড়ে এসে পড়ে ক্রমান্বয়ে আরো পিছনের লোক।

চারপাশের জনতা এখন আর হাঁটছে না, পুরোপুরি দৌড়চ্ছে। তারই মধ্যে স্পেশালের লোকজনেরা আশ্চর্য দক্ষতায় আমাদের পুরো

দলটাকে ঘিরে যেন একটা ব্যূহ তৈরী করে নিল। সামনে হরি ডানহাতে বড় একটা জলের বোতল উঁচু করে পথনির্দেশ করছে। কলকাতায় কালীঘাট আর চিড়িয়াখানা দেখতে আসা আঁচলে আঁচল বাঁধা দেহাতী গাঁওয়ারের অবস্থা এখন আমাদের। যে যার পাশের লোককে খিমচে ধরে রয়েছি, দলছাড়া না হই। হঠাৎ পেছন থেকে শোভনাদি ডুকরে উঠলেন, 'আমার বাবা! আমার বাবা কই!' শক্ত করে তাঁর আঁচল ধরে রেখে দাদা বললেন, 'আছেন কোথাও, ঘাটে গিয়ে দেখা হবে।' শোভনাদি এদিক-ওদিক ফিরে দেখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সাধ্য কি সেই অমানুষী স্রোতের বিপরীতে ফেরা। ভিড়ই জোর করে সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছে। পা টাটিয়ে উঠছে। দম আটকে আসছে। প্রতি পায়ে মনে হচ্ছে যে হোঁচোট খেয়ে পড়ে যাব। হঠাৎ মনে হল ছিন্ন শেকলের মতো একপায়ে যে আমার চটি, তাই আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে চলতে। কিন্তু এই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে চটি খোঁজার মতো খোলাও যে সমান অসম্ভব। পা টেনে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলতে চলতে হঠাৎ কি করে জানি না আপনা থেকেই এ চটিটাও খুলে গেল। এবারে আমি মুক্ত। দুপায়ের নিচে ভেজা নরম মাটিতে কি আরাম। চলার ধকলে বেশ গরম লাগছে এখন। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া যেন শীতল হাতের আদর। হঠাৎ দেখি পায়ের নিচের ব্রীজটা সোজা গিয়ে নেমেছে হর-কী-প্যারীতে। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। ছলছল ঢেউয়ে মুচকি মুচকি হাসছে চঞ্চল জল। মজা পাচ্ছে মানুষের এই মত্ততা দেখে। বাণীদি হঠাৎ সামনে টাওয়ারের ঘড়ির দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একী, এত আগে নিয়ে এলে কেন আমাদের। যোগের এখনো অনেক দেরি। আমি এখন নাইবো না।' ঘড়িতে দেখি দুটো পনের ছেড়ে এগিয়ে গেছে কাঁটা। দুটো কুড়ি থেকে স্নানযোগ শুরু। অরুণদা সামনে ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবক স্বামীজীদের আবার জিজ্ঞেস্ করে কন্‌ফার্ম করে নিলেন। আমরা ঠিক একেবারে যোগ

শুরু হবার মাহেন্দ্রক্ষণেই জলে নামবো। খুশী মনে সকলে তৈরী হচ্ছি। বাণীদির কিন্তু এক কথা। উনি তিনটে পঞ্চাশে স্নান করবেন। কিন্তু তিনটে পঞ্চাশই বা কেন? যোগের মধ্যে তখন আবার কোন মহাযোগ আছে নাকি! হরি হেসে বলল, 'মাসীমা আসার সময়ে তাড়া দিচ্ছিলেন, এসে আবার রাগ করছেন তাড়াতাড়ি আসার জন্য।' কিন্তু না, কারো কথায় কান দেবার মানুষ বাণীদি নন। ভারত সেবাশ্রমের পাব্লিক নোটিশ বোর্ডে ঘোষিত টাইমিং তিনি মানেন না। কোন সাধুর কাছে গোপন টিপস্ পেয়েছেন যে তিনটে পঞ্চাশেই নাকি সত্যিকার যোগ। কাজেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা ঠিক দুটো কুড়িতেই জলে নামলাম। ঠিক এইসময়েই যে এসে পৌঁছতে পেরেছি, একে দৈব ছাড়া কি বলবো। কারণ এখানে কাউকেই দাঁড়াতে দিচ্ছে না। বাঁশী আর লাঠি হাতে অজস্র পুলিশ ডাঙায়, আর পাগড়িতে ব্যাজ আঁটা অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক জলে সকলকে তাড়া দিয়ে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখছে। ভালোই করছে। তা না হলে ভিড় জমাট বেঁধে আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। জলে পা ছোঁয়াতেই মালুম হল জল কী ঠাণ্ডা। পা যেন ধারালো দাঁতে কেটে যাচ্ছে। আর জলে কাদায় পেছল হয়ে কি মারাত্মক হয়ে রয়েছে সিঁড়িগুলো। কোনো রকমে একটা ডুব দিয়ে সন্তর্পণে উঠে আসছিলাম। অরুণদা ধরে ফেললেন। অন্ততঃ তিনটে ডুব নাকি দিতেই হয়। অগত্যা তাই সই। নাক চোখ বুজে তিনটে ডুব দিয়ে এবার দৌড়ে উপরে উঠে আসি। শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর কী ঠাণ্ডা হাওয়া। কলকাতায় যাঁরা গরমের ভয় দেখাচ্ছিলেন তাঁদের মুখগুলো মনে পড়ল। কোনমতে কাপড়টা বদলে আপাদ-মস্তক গরম চাদর জড়াই। হরি বেচারী সকলের মাঝখানে দুহাতে গলায় কাপড় আর ব্যাগ ঝুলিয়ে আলনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে দেখি বাণীদিও জলে নেমেছেন। জানি না পুলিশের মৃদু লাঠির খোঁচাতেই মনের ঘড়ির কাঁটা দুটো তিরিশেই তিনটে পঞ্চাশে

'পৌঁছে গেল কিনা। যাই হোক, স্নানের পর মেজাজটা কতটা ভিজল না জেনে এখন ওঁর কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল। আমরা ফেরার পথ ধরে হাঁটতে থাকি। এবার উল্টোদিকের ব্রীজে ব্রহ্মকুণ্ড পেরিয়ে গঙ্গামন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা। এখানকার চওড়া চত্বরে ভিড়টা কম। স্নান সেরে এপারে এসে কিছু লোক ভীম গোড়ার দিকে আবার কিছুবা বাজারের পথ ধরেছে। রাধা বলে, 'দাঁড়াও, জলে একটা প্রদীপ ভাসাই'। এই মধ্যরাতেও ফুলের ডালায় দিয়া সাজিয়ে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই। আমাদের দলের কারো কাছেও নেই। মধ্যরাতে স্নান করতে এসে কে আর পকেটে দেশলাই রাখে। ডালি হাতে রাধার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'জ্বালালেও তো এই হাওয়ায় এক্ষুনি নিভে যাবে। তার চেয়ে এমনিই ভাসিয়ে দে।' 'তাই দিতে হবে'—রাধা বিষণ্ণ মুখে ঘাটের দিকে নেমে যায়। জলের টানে ডালি ভাসতে ভাসতে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের ফেলে সঙ্গীরা অনেক এগিয়ে গেছে। এবারে তাড়াতাড়ি পথ চলি। পথ এবার আবার ওপারে গিয়েছে। একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে ওপারে গিয়ে আবার আরেকটা ব্রীজ দিয়ে ফিরে আসা। উপায় নেই। এই যাওয়া আসা করে বিলম্বিত পথেই পথ পেরোতে হবে। খোলা চড়ার বুকে হাওয়া হুহু করে ঝাপটা মারছে। এদিকে আলোও কম। সামনে পিছনে অনবরত হেঁটে যাচ্ছে অজস্র মানুষ। অচেনা মানুষ, কিন্তু এই একপথে যারাই চলছে তাদের সঙ্গে কিরকম একটা একাত্মতায় বুকের মধ্যে মনে হয় যেন সকলকেই চিনি। বাজারের সামনে এসে রাধা দাঁড়ায়, 'চল মিতুদি, একটু গরম চা খাই।' আমি চা খাই না রাধা জানে। আর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলে তো হাতে গরম চা রেডীই রয়েছে। আসলে ও এখন ঘরে ফিরে সকলের মুখোমুখি হতে চায় না। সকলে মিলে এখন বড্ড শব্দ। ভরা ঘট উপচে পড়লে ঘটভরণের চেয়েও জোরে বাজে। আমি জানি এই

ঘুরে এসে এবার রাধার মনে মনে এই [illegible] [illegible] চলে ক্রমাগত।

চা বানাতে দেরি হচ্ছিল। ভেতরের ঘরে আমাদের আগে থেকে অপেক্ষা করছে অনেক খদ্দের। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। রাধা অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিল অন্ধকারের দিকে। অনেকটা অন্ধকার পেরিয়ে দূরে ব্রহ্মকুণ্ড। সেখানে আলোয় আলোময়। ওপরের অন্ধকার আকাশের অনেকটাও উজ্জ্বল ছটায় ভরে আছে। গরম চায়ের গ্লাস রুমালে জড়িয়ে রাধা ক্লান্ত গলায় বললো, 'সব শেষ করে এলাম মিতুদি।'

'সব শেষ মানে? প্রবাল—'

এবার রাধা হেসে ফেলে সোজাসুজি তাকায়, 'হ্যাঁ, প্রবাল ডিভোর্সের কাগজপত্র রেডী করে সব ব্যবস্থা করেই এসেছিল। আমাকে নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে সাতদিনের মধ্যেই সব হয়ে গেল।'

'ডিভোর্স! কিন্তু কেন?'

'রাণুকে বিয়ে করবে বলে।'

কথাটা আমি জানতাম। জানতাম ঠিক নয়, ভাবতাম। কারণ রাধা আমাকে কোনোদিন খুলে কিছু বলেনি। কিন্তু ছোটননদের বন্ধু, ছোটবেলা থেকে এ বাড়ির প্রিয়পাত্রী রাণুর রূপের গল্প, গুণের গল্প, ঐশ্বর্যের গল্প বলার সময় অজান্তে রাধার গলার স্বর, বলার স্বর, চোখের চাউনি আমাকে বলে দিয়েছে সবকিছু।

'দুবছর আলাদা থাকলে ডিভোর্স পেতে কোন অসুবিধা হয় না। আর এলাহাবাদ কোর্টে তো ওদের খুবই জানাশোনা।'

'তুই সই করলি কেন?'

'করব না কেন?'

গরম চায়ে চুমুক দিতেই জিভটা পুড়ে গেল। সত্যিই তো, সই করবে না কেন? না করেই বা কি লাভ হত, কিন্তু এইভাবে কিছু

না বলে রাধাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে সই করানো—এভটা না করলেই ভালো হত। এখানে বললেও রাধা নিশ্চয় সই করতো।

'কি জানো মিতুদি, এখানে সবার সামনে ওসব বলতে প্রবালের হয়তো লজ্জা করতো। এই ভালো হয়েছে।'

'প্রবালের লজ্জা করতো? লজ্জা আছে নাকি ওর?' কথাটা বলেই বুঝি একথায় কোন অর্থ নেই। সুধা না ভরলে শূন্যতাও ভালো, কিন্তু গরল নয়। এখানে সব কথা জানিয়ে দিলে রাধার ভাইরা হয়তো কোর্টে লড়তে চাইতো। কত কথা উঠতো, কত পাঁক। তার মধ্যে পড়ে রাধার অবস্থা কি হতো! বোঁটা আলগা হলে ফুলকে অনায়াসে ঝরতে দেওয়াই সুন্দর। ধরে বেঁধে ধরে রাখতে চেয়ে অনর্থক দলে-মুচড়ে-বিকৃত করে লাভ কি! আমার মনে হ'ল দুবছর শ্বাসরুদ্ধ করে সিঁদুর পরে রাধা যে আশঙ্কায় সেজে বসেছিল, এতদিনে তার থেকে মুক্তি পেয়েছে। ওপরের কালো আকাশে, নিচের কালো জলে ছলছল করে অবিরাম বয়ে চলেছে মুক্তির সুর। সাহস করে আজ জলে নেমে পড়েই রাধা ছুঁতে পারল তার ভেতরের স্নিগ্ধতাকে।

দশ

মনোহরধামে যখন পৌঁছলাম তখন পূবদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। বারান্দায় স্টোভে চা চাপানো! রেলিং-এ গাদা করা ভিজে কাপড়ের স্তূপ। আজ সকলেই গা-এলিয়ে দিয়েছে। শোভনাদি রেণুদির কাপড় মেলার উৎসাহ আর দক্ষতা নিয়ে আমরা রোজই হাসাহাসি করি। শুধু নিজেদেরটা নয়, অন্যদের মেলে দেওয়া কাপড়ও সযত্নে টানটান করে উল্টেপাল্টে, ভিজে, আধভিজে ইত্যাদি শ্রেণীবিন্যাসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেলে এবং অন্য বাসিন্দাদের কাপড়

থেকে আলাদা করে চিনে উঠিয়ে এনে আমাদের মতো কাজ চোরাদের জন্য মহাউপকারী সমাজসেবা করেছেন। কিন্তু আজ দেখছি তাঁদের কাপড়ও সেখানে গাদা করা রয়েছে, মেলা হয় নি। রাধার আজ সমাজসেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। সে একমনে সকলের কাপড় মেলতে লাগল। আমি ঘরে ঢুকে গদিতে টানটান হই। ইরাদি তাহলে সত্যিই চলে গেছেন। ওঁর শোবার গদিটা গোটানো। বেডিং স্যুটকেস কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা। অর্থাৎ বিউটিকেস আর ভ্যানিটি ব্যাগটি নিয়ে ঝাড়া হাত-পা প্লেনের যাত্রী মেমসাহেব রওনা হয়েছেন। কিন্তু এ কী, ওদিকে দেখছি জার্নালিস্টরা দুজনে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। দেখেই বোঝা যায় সারারাত্রি জাগরণের পর কাঁচা ঘুম নয়, সারারাত্রি সুখনিদ্রার পর পরিতৃপ্ত ঘুম। অর্থাৎ আমরা যখন সারারাত্রিব্যাপী এই স্নানযাত্রায় ঘুরে ঘুরে সারা হয়েছি, ওঁরা দুটিতে তখন এই ফাঁকা ঘরের আরামটা পুরো উশুল করে নিয়েছেন। কিন্তু পুণ্যযাত্রা স্নান না করুন, সাংবাদিকের কৃত্যাও তো করলেন না। সযত্নে পরিষ্কার করা টেপ্ আর ক্যামেরাও যে এই মাহেন্দ্রক্ষণে ঘুমিয়েই রইলো। যাক্‌গে, আর ভাবিতে পারি না, পরের ভাবনা লো সই, তার চেয়ে পাশ ফিরে একটু ঘুমের চেষ্টা দেখি।

'ওকি মিতুদি ঘুমোচ্ছ নাকি? সাধু দেখতে যাবে না?'

'সে তো বেলা দশটায়। ততক্ষণ চুপ করে ঘুমিয়ে থাক্।'

'সারারাত জেগে এখন ঘুমোলে কিছুতেই দশটায় উঠতে পারবে না। প্লীজ্ ঘুমিয়ো না।'

বিরক্ত হয়ে ঘড়ি দেখি, এখনো ছটাও বাজেনি।

'ঠিক আছে, তুই তাহলে জেগে থাক্ সময়মতো আমাকে ডেকে দিস্। দুজনে মিলে জেগে থেকে কি লাভ!'

রাধা এবার চুপ করে যায়। একটু পরেই দেখি সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

'শোভনাদির বাবা স্নান সেরে আমাদের অনেক আগে ফিরে এসেছেন। ভিড়ের মধ্যে অসহায় বুড়ো মানুষকে দেখে এক পুলিশ হাত ধরে স্নান করিয়ে রাস্তায় উঠিয়ে দিয়েছে। শোভনাদির অনুযোগের উত্তরে হেসে বললেন, 'হর-কী-প্যারীতে কুম্ভস্নান করতে এসেছি, মহাদেবই সকলকে দেখছেন। তুই এত ভাবিস্ কেন?'

'ঠিক কথাই তো, তুমি বরং নিজেকে ঠিকমতন দেখ তাহলেই হবে'। স্বামীর কথায় শোভনাদি আর উত্তর দেন না। সারা ঘরেই কথাবার্তা কমে আসতে আসতে শেষে একেবারেই থেমে গেল। চোখ বুজে সবে একটু ঝিমুনি এসেছে—কেটলির গায়ে চামচ বাজিয়ে বাজিয়ে হরির ঘোষণা—'দাদুরা উঠুন, মাসীমারা উঠুন, বৌদিরা উঠুন। চা এসে গেছে, গরম চা। এই তো সবে চা খেয়েই শুয়েছে সবাই, এখন আবার চা কে খাবে। ওমা, আমি মুখ খোলার আগেই দেখি এদিকে ওদিকে সবাই শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। দশটায় সাধুদের শোভাযাত্রা শুরু হবে। তার আগে গিয়ে পথের ধারে জায়গা দখল না করলে কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। এই চায়ের রাউণ্ড তারই ওয়ার্নিং বেল্। উঠে বসে দেখি দরজার পাশে একটা প্রমাণ সাইজ মাটির ঘট। ওপরে সশীষ ডাব সাজানো, ফুলের মালা জড়ানো। গায়ে একটু আলপনা থাকলেই বিয়ে বাড়ির কথা মনে হতো। এ ক'দিন এমনি ঢালা বিছানার ইচ্ছেমতো গড়িয়ে আর আড্ডা দিয়ে দিয়ে কেমন একটা বিয়ে বাড়ির সুর এসে গেছে। কিছু বলার আগেই বাণীদি কলঘর থেকে বাসী কাপড় কেচে এসে দাঁড়ালেন। ভোর রাত্রে কুম্ভস্নান সেরে শুয়েছেন, বাসীটা হ'ল কি করে সেটা অবশ্য এক বাণীদিই বলতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ওঁর বিচার যে ফুলপ্রুফ সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায়। অধিকন্তু খানিকটা গঙ্গাজল হাতে নিয়ে মাথায়, ঘটে এবং চারপাশে গদিতে শুয়ে থাকা দেহগুলিতেও

ছিটিয়ে সারা ঘরটিকেই পবিত্র করে নিলেন। তারপর হরিকে বললেন, 'চল্ বাবা আমার সঙ্গে ঘটটা নিয়ে গঙ্গার ঘাটে, বামুনকে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে আসি।'

ও হরি, এই শ্রীমান ঘট এখন হরিবাহিত হয়ে বামুনের কাছে যাবে! কিন্তু কেন, সে ব্যাপারটা আবার কি? বাণীদি বলেন, 'আজ যে জলসংক্রান্তি, ধর্মঘট ব্রত। যবের ছাতু আর ঘটভরা গঙ্গাজল দান করলে সর্বপাপক্ষয় হয়।'

বেশ কথা। কিন্তু বামুন খুঁজতে বেচারী হরিকে ওই জলভরা পেল্লায় ঘটটাকে গঙ্গার ধার অবধি বওয়ানো কেন? ওই তো পাশের ঘরেই কত সৎব্রাহ্মণরা বসে চা খাচ্ছেন। এই তো খানিকক্ষণ আগেই কুম্ভস্নান করে তাঁরা সব এখন শুচিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তাঁদের দিয়ে দিলে হয় না?

এবারে বাণীদি রেগে যান, 'ব্রাহ্মণ কি শুধু চ্যাটার্জী ব্যানার্জী পদবী থাকলেই হয়। ব্রাহ্মণের বৃত্তি নিতে হয়। তবেই সে ব্রাহ্মণকে দান করলে ফল হয়।'

সামনে ঘট কাঁখে হরি আর পেছনে যবের ছাতুর ঠোঙা হাতে বাণীদির পিছু পিছু আমিও চলি। বেশীদূর নয়, ভোলাগিরির ঘাটেই যাওয়া হবে। স্নান করে ফেরার ভিড় এখন কমে আসছে। এখন আবার সবাই ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে যাচ্ছেন সাধুদের স্নান দেখতে। ভোলাগিরির ঘাটে নেমে দেখি একদম ফাঁকা। কাল রাত্রে যোগের সময় ভিড় এড়াতে অনেকেই এখানে স্নান করেছিলেন। এখন কেউই নেই। ঘাটের ওপর এক কালো পাথরের শিবলিঙ্গ আর এক শ্বেতমর্মরের শিবমূর্তি পাশাপাশি বসানো। তার সামনে ছাতার তলায় কিছু ফুলবেলপাতা সাজিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। বাণীদি দেখি তাঁর সামনে গিয়ে বসলেন। হরি কলসীটা পাশে নামিয়ে রাখল। বৃদ্ধ বিনাবাক্যব্যয়ে কিছু ফুলবেলপাতা বাণীদির হাতে গুঁজে দিয়ে মন্ত্র বলতে লাগলেন—

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।'

বাণীদি ফুল-বেলপাতা কলসীর ওপরে দিলেন। হাতজোড় করে নিজেই মনে মনে কিছু বললেন। তারপর আঁচলের গিঁট খুলতে লাগলেন।

বৃদ্ধ আবার ফুল বেলপাতা হাতে বাণীদির হয়ে বলে যাচ্ছেন, 'এত স্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ-সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।'

বাণীদি কি করে জানলেন যে এ বৃদ্ধ সত্যিই ব্রাহ্মণ। এই কুম্ভে শুনেছি এমনকি সাধুর ভেক ধরেও এসেছে কত অসাধু, আর ব্রাহ্মণের বৃত্তি নেওয়া তো কোন ব্যাপারই না। অবশ্য এ বৃদ্ধের কপালে চন্দন কুঙ্কুম হলুদের যেমন সুরচিত রং বাহার এবং মাথার পিছনে শিখাটি যেরকম পুরুষ্টু এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণকে অর্পণের মন্ত্রে যেমন আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ, তাতে আমি আর কিছু প্রশ্ন তুলতে সাহস পাই না। সবচেয়ে বড় কথা বাণীদির স্বভাবরুক্ষ মুখে যেমন তদগত প্রশান্তির ছায়া, তাকে নষ্ট করতে একেবারেই মন চায় না। ঘটদানপর্ব শেষ করে বাণীদি এবারে চললেন সাধুসন্দর্শনে। আমিও সেই সঙ্গেই চলি। অন্য সঙ্গীরা এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পৌঁছে গেছেন কে জানে। শেষে বাণীদিকে ছেড়ে একুল ওকুল দুকুলই যাবে আমার। সাধুরা আসবেন গঙ্গার ওপার দিয়ে। পুল পেরিয়ে ওপারের রাস্তায় উঠেই দেখি সে কি ভিড়! রাস্তার দুপাশে অগণিত জনতা—আট দশ সারি করে বসা। কারও মাথায় ছাতা, কারও বা ভিজে কাপড়। মনে হয় শেষ রাতে গঙ্গাস্নান করেই এরা এখানে এসে বসে গেছে। আমাদের দাঁড়াতে হ'ল অনেকটা পেছনে। সামনে বসা সারির পেছনে আমাদের আড়াল করে প্রচুর লোক দাঁড়ানো। পায়ের নিচের বালি তেতে উঠছে। কড়া রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আমাদের সঙ্গে না আছে ভেজা কাপড়, না ছাতা। বাণীদির তো তুচ্ছ দেহটার জন্য কোন মায়াই নেই। আসলে দেহটা এত বেশী ভালো বলেই মায়া করার দরকার পড়ে না। এসে অবধি ত্রিসন্ধ্যা স্নান আর উপোসের ঘটা দেখে আমরা বলাবলি করছি এই বয়সেও এত সুন্দর স্বাস্থ্য সত্যিই ভগবানের আশীর্বাদ। আমরা এত যত্নে পুতুপুতু করে রেখে দেহটাকে একেবারে কাঁচের পুতুলের মতো ভঙ্গুর করে তুলেছি। সাধু দর্শনের জন্য কোথায় কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটে চলে যাবো তা না দাঁড়িয়ে এই তুচ্ছ শরীরটার কথা ভাবছি। মনকে শাসন করে বাণীদির পেছনে এগিয়ে যাই। অত ভিড়ের মধ্যেও ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে উনি প্রায় দ্বিতীয় সারিতে চলে এসেছেন। এবারে সামনে রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ক্রমাগত জিপে করে পুলিশ যাতায়াত করছে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক বালতি ভরা জল আর আর বড়ো শলার ঝাড়ু এনে রাস্তা ধুয়ে দিতে লাগল। মৌনী অমাবস্যার স্নানের দিনও দেখেছিলাম সাধুদের স্নানের আগে এমনি রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা। তার মানে তাঁদের আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। হঠাৎ কানে এলো পুলিশের জিপ থেকে মাইকে করে বার বার বিনীত ঘোষণা হচ্ছে—আপনারা সাধু সন্ত, দয়াবান। দয়া করে ক্রোধ সংবরণ করে নিজের নিজের গন্তব্যে চলে যান। কি ব্যাপার, দুর্বাসারা আবার ক্রোধ করছেন কেন! ভয়ে ভয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিই। শোভাযাত্রা এখন সামনে এসে গেছে। আগে এই শোভাযাত্রায় আগে পরে যাওয়া নিয়ে সাধুদের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা হ'ত। গ্রামের জমিদারদের মধ্যে যেমন প্রতিমা বিসর্জনের আগে পরে নিয়ে নানা তরফের শরিকী দাঙ্গা একটা প্রচলিত ব্যাপার, এ-ও অনেকটা তাই। অর্থাৎ বীতরাগভয়ক্রোধ এঁরা মোটেই নন। সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য একত্র হতে এসে তাঁদের সামনে এঁরা অশান্তির, অনৈক্যের আদর্শই স্থাপন করেছেন। বলাবাহুল্য, সাধুদের এ আচরণও কোন ব্যক্তি মানুষের নয়, সাধারণ জনতাচরিত্রেরই.

বৈশিষ্ট্য। সাধুরাও যে মানুষ, অন্ততঃ তাঁদের অধিকাংশই যে পারেননি জৈবব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে মানবাতীত মহিমায় পৌঁছতে—এ তারই প্রমাণ। মৌনী অমাবস্যার দিনও দেখেছিলাম প্রসন্নমূর্তি নাগাসাধুরা কমলালেবু নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে সহাস্যকৌতুকে জনতার দিকে ইতস্ততঃ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। কৃতার্থ প্রণামে ক্রমশঃ মাত্রাছেঁড়া হয়ে উঠল কৃপাবিতরণের উৎসাহ। লেবু ফুরিয়ে যাওয়ায় গঙ্গামন্দিরের পূজারী আর যখন দিতে পারলেন না, সেই সহাস্য সাধুরাই মুহূর্তে কি হিংস্র, রোষপরবশ মূর্তিতে তাঁকে আক্রমণ করলেন। আসলে ভক্তি করার চেয়ে ভক্তি গ্রহণ করাই কঠিনতর। অভিমানের মদ যত সহজে মাথায় চড়ে যায়, এমন আর কিছু নয়। সাংসারিক সমস্ত মোহকে উত্তীর্ণ হয়েও সাধু যখন পরাভূত হন সেই সাধুত্বেরই অহমিকার কাছে, বড় শোচনীয় সে পরাজয়। তার ফল শুধু ব্যক্তিগত পরাজয়ের ক্ষতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যাপ্ত হয়ে যায় সামগ্রিকভাবে সাধুসমাজ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণায়। একথা আমি অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারছি সেই সাধুত্বের মহিমা সম্বন্ধে সমুচ্চ শ্রদ্ধাবোধের ফলেই। আচার্য শঙ্কর তাঁর মঠানুশাসনে আদর্শ সন্ন্যাসীর সংজ্ঞায় বলেছেন,

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদবেদাঙ্গাদি বিশারদঃ।
যোগজ্ঞ সর্বশাস্ত্রাণামস্মাদা স্থানমাপ্নুয়াৎ॥

সাধুর শুচিতার প্রথম পাঠই জিতেন্দ্রিয়তা। এ ক'দিন ধরে সমস্ত আলোচনা সমস্ত আয়োজনের পেছনে দেখছি একটাই আশংকা—সাধুরা না রুষ্ট হন! সাধুরা কি কুম্ভে আসেন সাধারণকে কৃপা করতে, না সেবাপরাধের শাস্তি দিতে। বলা বাহুল্য সাধুদের সম্বন্ধে এই ভীতির অনেকখানি দায়িত্ব বর্তায় নাগাসাধুদের ওপরে। মধ্যযুগে বিজাতীয় ধর্ম ও শাসনের আগ্রাসন থেকে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যই দশনামী সাধুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক সামরিক শাখারূপে নাগাসম্প্রদায়ের উদ্ভব। জাগতিক সমস্ত মোহ-বন্ধন এমনকি ঘৃণা-

লজ্জা-ভয়ের শেষ সূত্রটুকুও ছিন্ন করে ফেলে এরা যে শাস্ত্রচর্চা শুরু করেন. তার মূলে ছিল শাস্ত্রকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা। যুগপরিবর্তনে সে প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। রুদ্র উপাসনার লগ্ন অবসানে কর্মহীন ধরকরবালে এখন শুধু অনাবশ্যক ভার। সেই যে এক বিদ্রোহী সৈন্যের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল—বহুবছর একা জঙ্গলে আত্মগোপন করে সে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেই চলেছে. জানে না যে যুদ্ধ কবেই শেষ হ'য়ে গেছে। তেমনি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেরই গায়ের ব্যথায় উন্মাদ আজ এই সম্প্রদায়। দৈহিকরূপে শুধু নাঙ্গা সাজ করে আর নয়, অন্তরস্বরূপের আবরণ মোচনে এই উদ্যমকে পথান্তরিত না করে দিলে সমূহ সর্বনাশ। সে সর্বনাশ শুধু সাধুদের নয়, সাধারণ মানুষেরও। কারণ তাঁদের কৌতূহলে তাঁদের সম্ভ্রমের পীঠভূমিতেই এঁদের অস্তিত্ব। চোখের সামনে দেখছি এই কুম্ভের মরশুমে এসে কতলোক জামা-কাপড় তুলে রেখে নাগাসাধুর বেশ নিয়েছে। বিভিন্ন আখড়া তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সঙ্গে নিয়েছে। ফলে মেলার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পেয়েছে দুপক্ষই। কিন্তু কি পেল সেই সাধারণ মানুষ—যাঁদের কল্যাণের জন্য এই মেলার পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রীমৎশঙ্করাচার্য। সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সার বেঁধে বসে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তারা দেখল দুইদল প্রাকৃত পুরুষের শরিকী হানাহানি।

অসহায় পুলিশ আর স্বেচ্ছাসেবকরা দুইদল দাঙ্গাকারীর শ্রীঅঙ্গ বাঁচিয়ে দাঙ্গা থামাতে গিয়ে দুদলের হাতেই আঘাত পেয়েছেন। সাধুর প্রতি অশ্রদ্ধা যেমন অন্যায় তেমনি অসাধুতাকে সম্মান করাও মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু এই মেলাক্ষেত্রে সেই বেঠিক কাজ করেই প্রশাসন আজ মান রেখেছে। ভক্তিভাজনের চেয়ে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে ভক্তের আত্মসম্মান।

সাধুদের শোভাযাত্রায় প্রথমেই থাকেন উপাস্য শ্রীবিগ্রহ। সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধ্বজা উড়িয়ে হাতির পিঠে বা চতুর্দোলায়

স্বর্ণছত্রের নিচে চলেন সুসজ্জিত বিগ্রহমূর্তি। নাগাসম্প্রদায়ের জুনা আখড়ার দেবতা দত্তাত্রেয়; নিরঞ্জনী আখড়ার কুমারস্বামী বা ষড়ানন কার্তিকেয় অনুপম বসনভূষণে সেজে চলেছেন। সেই সঙ্গে চলেছে সম্প্রদায়ের পূর্বগুরুদের চিত্রাবলী। উজ্জ্বল অলংকারে সজ্জিত হাতি উট বা ঘোড়ার পিঠে কৃষ্ণ অঙ্গে উজ্জ্বল গৈরিক গাঁদার মালা দুলিয়ে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে নাগাসাধু। গৈরিকবসন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আছে সাদাকাপড়পরা কণ্ঠিধারী শিষ্যশিষ্যরা। ওমা, একেকজন মঠাধীশের ফেস্টুনে আবার তাঁদের পূর্বাশ্রমের কৃতিত্বের পরিচয়। এম.পাশ পি.এইচ.ডি এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীও ঘোষণা করা হয়েছে সাড়ম্বরে। কাল যখন জার্নালিস্টরা এসে বললেন যে তাঁরা এই মেলার আধুনিকতম আকর্ষণ পাইলট-বাবাকে দর্শন করে এসেছেন আমি আর আরতিদি হাসাহাসি করে আলোচনা করছিলাম যে, উনি হয়তো শিষ্যদের জন্য স্বর্গের সঙ্গে থ্রু এয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তাঁর নাম পাইলট বাবা। এখন দেখছি যে পরমজ্ঞানের বিচারেও অপরাবিদ্যার বহরটা বাজিয়ে নেওয়া হয়। এটাই স্বাভাবিক। কারণ পরাজ্ঞানের বিচার করার ক্ষমতা আছে কার! আর সেই অজ্ঞদেরই অর্থ যখন পরমার্থের চেয়ে বেশী প্রার্থনীয়, তখন এইভাবে বিজ্ঞাপন তো দিতেই হবে।

খোলা ঘোড়ার গাড়িতে দাঁড়িয়ে কোন মোহন্ত বিদেশী ঘড়িবাঁধা হাত উঁচু করে সহাস্যে আশীর্বাদ বিতরণ করছেন। কেউ নীরবে তাকিয়ে আছেন ভিড়ের দিকে। আবার কেউ বা একান্তই আত্মমগ্ন, অন্তর্মুখ। কয়েকজন সাধুবাবা দ্রুত পায়ে মিছিলের আগে চলে গিয়ে পোলারয়েড ক্যামেরা চালিয়ে ধরেছেন। কি-র্-র্-র্ শব্দ হচ্ছে চলমান চিত্রগ্রহণের। কোন কোন সাধু জনতার ভিড়েরও ছবি তুলছেন। মজা লাগছিল দেখে। মজা লাগছিল একথা ভেবে যে এই কৌতূহল তাহলে পারস্পরিক। আমরা যেমন তাঁদের দেখার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছি, তেমনি, তাঁরাও সেজে এসেছেন এই

কৌতূহলকে সম্মান দিয়ে। শোভাযাত্রায় সাধুর পরে সাধুর দল চলেছে। বিভিন্ন বেশ, বিচিত্রভূষা। কেউ জটাধারী, কেউ মুণ্ডিতমস্তক আবার কেউ বা শবর রাজার মতো পালকের মুকুটে শোভমান। কারো পায়ে ঘুঙুর, কারো খড়ম, কেউ বা নগ্নপদ। বাণীদি মুগ্ধ হয়ে দেখছেন তো দেখছেনই। দুই চোখ ভরে যেন দৃষ্টির প্রসাদে অভিষিক্ত করে নিচ্ছেন দেহমন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। রোদ এখন মাথার ঠিক ওপরে। পায়ের অবস্থাও সঙ্গীন। খানিকক্ষণ ওঁকে ডাকাডাকি করে শেষে একাই ফিরে চললাম আবাসে। বাণীদি মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন, আমার ডাক কানেও পৌঁছয়নি।

ফিরে দেখি ঘর প্রায় খালি। সকলেই শোভাযাত্রা দর্শনে গেছেন। এঁরা কজনে কেবল নিরিবিলিতে চায়ের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছেন। আনন্দ আমায় দেখে বলেন, 'তুমি একা যে, রাধা কই?' 'রাধা তো আজ আমার সঙ্গে যায় নি। সকালে যখন বাণীদির ধর্মঘটব্রত দেখতে যাই রাধা তখন ঘুমোচ্ছিল। মায়া হ'ল ডাকতে। ভেবেছিলাম পরে ও আরতিদির সঙ্গে যাবে। কিন্তু আরতিদি তো আজ ঘরেই বসা। বোধহয় রাত জেগে ক্লান্ত অরুণদা আর বেরোতে রাজী হননি। আর অরুণদা না গেলে একা আরতিদিকে ঘর থেকে বের করে সাধ্য কার! আনন্দের মতো বেরসিকও আড়ালে ওঁদের বলেন জোড়ের পায়রা। বলেন, 'দেখেছ, ওঁদের একার কোন জীবন নেই, দুজনে মিলে যেন একটাই জীবন।' আসলে আজকাল চারপাশের জীবনের স্রোত এতটাই নিজস্বতায় তীব্র হয়ে গেছে যে এরকম সর্বাত্মক সান্নিধ্যের ছবি বলতে গেলে চোখেই পড়ে না। নিজেদের মনের আয়নায় তাকিয়ে দেখি, দিনশেষে মোটামুটি একই ঘরে ফিরে আসি বটে, কিন্তু ঘরের বাইরে একেবারেই ভিন্‌প্রদেশের লোক আমরা। যেন বিভিন্ন ট্রেনে যাওয়ার পথে জংশনের প্ল্যাটফরমে ক্ষণিক মিলন। সামনে যতক্ষণ ততক্ষণ সহযাত্রীই সর্বস্ব। উল্টোমুখের

ট্রেনে ওঠার পর খাতায় লিখে নেওয়া ঠিকানায় আর যাওয়া হয় না কোনোদিন।

বেলা বাড়তে শোভনাদিরা সদর্লবলে ফিরে এলেন। একী কাণ্ড! মণিকা ফিরল জার্নালিস্টদের সঙ্গে। কাল স্নানের সময় ওঁদের অনুপস্থিতি নিয়ে এই মণিকাই না রংদার সব মন্তব্য করছিল! অনাবিল সারল্যে হাসতে হাসতে এসে বললো, 'ইস্ মিতুদি, তোমরা যে কি মিস্ করলে! বজতদাদের সঙ্গে আমি আজ নাগা সন্ন্যাসীদের দীক্ষা দেখে এলাম।' দীক্ষা দেখা! তাও আবার নাগা সন্ন্যাসীদের! হাঁ করে চেয়ে আছি দেখে মণিকার বোধহয় করুণা হ'ল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'অনেক ছবি তুলে এনেছি, কলকাতায় গিয়ে দেখাবো।' দীক্ষা তো শুনেছি এমন এক ব্যক্তিগত গোপন পর্ব যার অনুষ্ঠান হয় একান্ত বিরলে। শুধু গুরু আর শিষ্য ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকে না সেখানে। আর নিগূঢ়চারী নাগা সম্প্রদায়ের পক্ষে কৌতূহলী অপরিচিতের ক্যামেরার সামনে এই গুহ্যসংস্কারের প্রদর্শন—এ কি করে সম্ভব হতে পারে! আমার আর বাক্‌নিষ্পত্তি হচ্ছে না দেখে এবারে আরতিদি এগিয়ে আসেন—'তা, কি রকম করে হ'ল তাদের দীক্ষা?'

'কিছুই না, গেরুয়া কৌপীন পরা সাধুরা এক এক করে এসে দাঁড়ালেন আর গুরু নিজের হাতে তাদের কৌপীন খুলে দিয়ে হাতে তুলে দিলেন ত্রিশূল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, তাঁরা শোভাযাত্রা করে স্নান করতে চলে গেলেন।'

আমাদের হতভম্ব অভিব্যক্তি দেখে এবার স্বয়ং জার্নালিস্ট-মশাইয়ের করুণা হয়। একটু অবহেলাভরে হেসে বলেন, 'একী আর এমনি দেখা যায়। আমার সঙ্গে গেছে বলেই দেখতে পেল। গত ছদিন বাবার সঙ্গে বসে ছিলিম চড়িয়ে কত কষ্টে অনুমতি আদায় করেছি।'

'ছিলিম তো বাবা আর জার্নালিস্ট চড়িয়েছে, মণিকা তাহলে এসব আবোলতাবোল দেখলো কি করে ?'

আমার ফিসফিসানির জবাবে আরতিদিও ফিসফিস করে বলেন, 'ও তো এখন দেখবেই। পতি-পত্নীর মাঝখানে 'ও' হয়ে ঢুকছে, ওর কি আর এখন কোনো জ্ঞান আছে ?'

'ধ্যেৎ, কি যে বলেন। স্বামীস্ত্রীর সঙ্গে একজন বেড়াতে গেলেই বুঝি 'ও' হয়ে যায় ?'

'সবসময় হয় না, এখন হয়েছে। দেখছ না ভদ্রমহিলা কি কঠিন নির্বিকারমুখে টেপরেকর্ডার পরিষ্কার করছে।'

'তাহলে ঐ ভদ্রমহিলারই মনে পাপ। মণিকা নিশ্চয়ই ওসব ভাবেনি। সরলমনে ওদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল।'

'আমিও তোমায় সরলমনেই একটা কথা বলি, ঐ মহিলা কিন্তু জার্নালিস্টের স্ত্রী না।'

'তার মানে ? আপনি কি করে জানলেন ?' আরতিদি বলছেন বলেই অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাসই বা করি কি করে! এ ক'দিন ভদ্রমহিলা যেভাবে শয়নে-স্বপনে ভদ্রলোকের সেবা করছেন, তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি ঢং-এ একেবারে পতির গায়ের সঙ্গে লাগা আদর্শ ছায়েবানুগতা স্ত্রীর ভূমিকা দেখাচ্ছেন—তাতে কি করে একথা কেউ ভাবতে পারে!

'দেখো তুমি যে আনন্দের স্ত্রী তা নিশ্চিত বোঝা যায় যখন ও উত্তরে গেলে তুমি অবধারিত দক্ষিণে রওনা হও।'

'আর আপনি যে একেবারে অরুণদার পদচিহ্ন ধরেই চলাফেরা করেন, তাতে কি বোঝায় যে আপনি ওঁর স্ত্রী নন ?'

'আরে এতো আচ্ছা বোকা দেখছি। এসব কি অত যুক্তি মেনে বোঝানো যায়। আমি বলছি উনি ওঁর স্ত্রী নন।' আরতিদির গলা একটু চড়ে যেতে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে এধার ওধার তাকাই। না কেউ আমাদের কথা শোনেনি। মিসেস্ জার্নালিস্ট সুটকেস খুলে

ভদ্রলোকের পায়জামা পাঞ্জাবি বার করছেন। কাল সারাদিন ঘুরে ঘুরে ভদ্রলোকের পায়ে ব্যথা হওয়ায় স্ত্রীও ওঁকে ফেলে আর স্নান করতে যান নি। মণিকার মুখে শুনি বিকেলেও ওঁদের সঙ্গেই বেরোবে। পাইলট বাবাকে দেখতে যাবে। কিন্তু রাধা তো এখনো এল না। সকলে খেতে বসে গেছে। আমি বারান্দায় বেরিয়ে আসি। গম্ভীরমুখে একপাশে দাঁড়িয়ে অরুণদা। আনন্দ আর সুবলবাবু হরির সঙ্গে চুপিচুপি কি যেন বলাবলি করছেন। হরি এইমাত্র সকলের পাত্রগুলো নিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড থেকে জল ভরে এনেছে। অরুণদা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমরা খেয়ে নাও, আমরা একটু রাধার খোঁজ করে আসি।'

আরতিদি বললেন, 'তোমরা এলে একসঙ্গেই খাবো। দেখো, মেয়েটা বোধহয় কোথাও ভিড়ের চাপে আটকে গেছে। সাধু দেখার উৎসাহে লোকের তো আর মাথার ঠিক নেই।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেলেন। একটু তফাতে হরিও গেল। এতটা হেঁটে জল বয়ে নিয়ে এসে বেচারী আবার এক্ষুণি বেরিয়ে গেল। হাসিমুখে এদের এই অবিরাম কাজ করে যাওয়া দেখে সত্যি আশ্চর্য লাগে। সুবলবাবু যে কোথা থেকে এদের যোগাড় করেছেন জানি না। বাড়ির লোকজনদের তো আমরা কাজের কথা বলতেই ভয় পাই। বড়ো ঘরে খেতে বসে সকলে খুব হৈচৈ করছেন। কুম্ভস্নান ভালোভাবে হয়েছে, সাধুদর্শন হয়েছে। যাত্রা সফল সকলেরই। এইবার আর কোথায় কোথায় যেতে হবে—মুসৌরী, দেরাদুন, ফেরার পথে বেনারসে একদিনের জন্য নামা যায় কিনা এইসব আলোচনা হচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুকরো-টাকরা কথা কানে আসছে। রাধা যে কোথায় গেল একা একা! শোভনাদিদের সঙ্গে তো যেতে পারতো। দুপুরের রোদ বারান্দার ওধারে হেলে গেছে। বেলা প্রায় তিনটের কাছে। আনন্দ নিচে থেকে হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসেছে?' নীরবে মাথা নাড়ি।

নিচে থেকেই ঘুরে আবার বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে এলেন অরুণদা। তিনতলায় উঠে চুপচাপ ঘরে এসে বসলেন। আমরাও ঘরে এলাম। অরুণদার ভুরু কোঁচকানো মুখ গম্ভীর। পকেট থেকে ফাইভ-ফিফটি-ফাইভের খালি প্যাকেটটা বের করে নেড়েচেড়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নিচে গিয়েও সিগারেট আনতে ভুলে গেছেন। এতটা চিন্তিত হওয়ার কারণ বুঝি না। রাধা তো আর ছোট বাচ্চা নয় যে হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। সুবলবাবু এসে অরুণদার পাশে শুয়ে পড়লেন চুপচাপ। চোখের উপর হাত চাপা দেওয়া। এই অবেলায় রোদে ঘুরে ঘুরে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ভঙ্গি দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করি না। আরতিদি লেবুর শরবত বানিয়ে এনে গ্লাস এগিয়ে ধরেন।

'আমি খাব না, দরকার নেই।'

খুবই অবাক লাগে। অবাক আর অদ্ভুত। সুবলবাবুকে ধৈর্য হারাতে কখনো দেখিনি। চরম বিপর্যয়ের সময়েও সহাস্য মুখে সকলকে ভরসা দেওয়াই তাঁর স্বভাব। আর আজ এই ভিড়ের ডামাডোলে একটি বয়স্থা তরুণী দুপুরবেলা ফিরতে একটু দেরি করলে সেজন্য এতটা উদ্‌ভ্রান্ত হবার কি কারণ! রাধাও নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেরি করছে না। ভিড়ের চাপে হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে। এপথ ওপথ এলোমেলো ঘুরিয়ে দেওয়ায় অন্যদিক থেকে হয়তো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। বেচারীর ওপর এতটা রাগ করা ঠিক নয়। হরি আর আনন্দর এবারে একসঙ্গে প্রবেশ। 'না, ওখানে নেই।'

'নেই, তুই ঠিক দেখেছিস? নামের লিস্ট মিলিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখেছিস?' পাওয়া যায়নি শুনে সুবলবাবু এবার অনেকটা নিশ্চিন্তমুখে উঠে বসেন। একচুমুকে শেষ করে ফেলেন প্রত্যাখ্যাত শরবতের গ্লাস। অবাক হয়ে শুনতে থাকি, নামের লিস্ট মেলানো মানে—ওঁরা কি পুলিশের হারানো-প্রাপ্তি দপ্তরে খুঁজতে গিয়ে ছিলেন নাকি রাধাকে!

অরুণদা বলেন, 'তোমরা দুশ্চিন্তা করবে বলে বলিনি, ভয়ংকর সম্ভাবনার কল্পনাতেই আমরা এতটা আপসেট হয়েছিলাম।' ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে পদ্মদ্বীপের ব্রীজের মুখে নাকি মাটির বাঁধ দেওয়া রাস্তা ভেঙে পড়েছে। গর্তের মধ্যে মানুষের পায়ের চাপে ইঁদুরের মতো মারা পড়েছে মানুষ। হরি সেকথা শুনে এসে খবর দিতেই ওঁদের মনে হয়েছে রাধার কথা। এরকম একা তো ও কোনোদিন বেরয় না। আজ যদিবা একা গেল, ফিরছে না কেন এখনো! এসেছে মনভরা শূন্যতাকে সঙ্গী করে, সে মেয়ে তো স্বেচ্ছায়ই যা খুশী তাই করতে পারে। বাড়ির কেউ সঙ্গে নেই। দায়িত্ববোধ থেকেই দুশ্চিন্তা বাড়ে। আর দুশ্চিন্তা একবার শেকড় গাড়লে ডালপালা মেলে মহীরুহ হতে দেরি হয় না। সেকথা আমাদের কাছে প্রকাশ না করে সোজা ছুটে গিয়েছেন হাসপাতালে। প্রথমে আহতদের মধ্যে খুঁজে দেখেছেন। না পেয়ে চারদিকে মাইকে নাম ঘোষণা করে বার বার ডেকে বলেছেন ফিরে আসতে। কোন সাড়া না পেয়ে শেষে আনন্দ হরিকে নিয়ে গিয়ে অকুস্থলে সারি করে রাখা মৃতদেহগুলিও নামের লিস্ট মিলিয়ে খুঁজে দেখে এসেছেন। এইবার অবশ্য খুঁজে না পাওয়াতেই স্বস্তি। তাহলে ভিড়ের চাপে বা পথ ভুলে দূরে কোথায় গিয়ে পড়েছে। একসময় ফিরে আসবে ঠিকই। এবার দুশ্চিন্তা শুরু হয় আমার। আমি কেন আজ রাধাকে রেখে বেরিয়ে গেলাম। বাণীদির ধর্মঘটব্রতের পুণ্য দর্শন করতে গিয়ে একী পাপের শাস্তি হ'ল আমার। আরতিদিদের কথাবার্তা আমার কানে যাচ্ছিল কিন্তু মাথায় ঢুকছিল না। আরতিদি এবার ওঁদের ভাত বাড়ার তোড়জোড় করছেন। বারান্দার রেলিং ধরে সোজা চেয়ে ছিলাম পথের দিকে। সারা পথে ভিজে কাপড়ের জল নিংড়াতে নিংড়োতে আসছেন আগরতলার মাসীমা-মেসোমশাই, আর একী, পেছনে আমাদের শ্রীমতী রাধা! সব উৎকণ্ঠা মুহূর্তে অন্ধ রাগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইভাবে মানুষকে ভয় দেখায় কেউ!

আরতিদি আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের কথা বোঝেন। রাধা এসে দাঁড়াতে আমি মুখ খোলার আগেই বলে ওঠেন, 'ভালই হ'ল, এতজনের দুশ্চিন্তার নিঃশ্বাসে কতখানি কর্মফলের কালো মেঘ উড়ে গেল। জানতো, মিথ্যা মৃত্যুর রটনায় মানুষের আয়ু বেড়ে যায়।'

আগরতলার মাসীমার আজ সংক্রান্তির উপোস। বেরোবার সময়েই বলে গিয়েছিলেন যে দুপুরে খাবার সময় ফিরবেন না। তাই ওঁদের জন্য চিন্তা ছিল না কারো। কিন্তু রাধা যে ওঁদের সঙ্গে যেতে পারে একথাটাও কারো মাথায় আসেনি। রাধা আমার মুখ দেখে হেসে ফেলে। হাত ধরে বলে, 'রাগ করো না মিতুদি, অন্ততঃ আমার জন্য চিন্তা করারও এত লোক আছে সেকথা জেনে কত ভালো লাগছে বলো তো?' তাকিয়ে দেখি ওর হাসিভরা চোখের কোণে জল টলটল করছে। ওরা এতক্ষণ ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে মনভরে সাধুদর্শন করে শেষে সাধুদের স্নানে বিগতপাপ গঙ্গার স্নিগ্ধ ধারায় আবার অবগাহন করে এসেছে।

এগার

কলকাতা থেকেই শুনে এসেছিলাম এবারে 'কালকূট' আসছেন কুম্ভমেলায়। প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতায় আমরা পেয়েছি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।' এবার পরিণত উপলব্ধিতে কি উপহার আমাদের দেবেন, পাঠকহিসেবে দারুণ প্রত্যাশা তো রয়েছেই। ভালো বইয়ের বৈশিষ্ট্যই হলো, যতবার পড়া যায় ধীরে ধীরে খুলে যায় নতুন নতুন ঐশ্বর্যের লুকানো ভাণ্ডার। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' প্রথম পড়েছিলাম প্রায় কৈশোরের কোঠায়। সত্যি বলতে কি, বিশেষ ভাল লাগেনি। জীবনকে তার সম্পূর্ণতার রুক্ষ পরিচয়ে সত্যি করে খোঁজার চেয়ে চারুশিল্পীর চিকণ কলমের সাজানো ছবিতেই

তখন মন টানত বেশী। পঁচিশ বছর পরে লাইব্রেরী থেকে আবার বইটি নিয়ে এলাম। এবারে কালকুট আমায় মগ্ন করে নিলেন। হয়তো সময়, হয়তো বয়স বা মানসিকতা, কিংবা হয়তো বা এসবেরই সমাহারে এবারে আমার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছিল। সারা-দুপুরে বইটা শেষ করে উঠে সন্ধ্যায় টি. ভি খুলে দেখি সেই শনিবারের নির্বাচন 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।' কুম্ভের পথে পা দেবার আগেই কালকুট আমাকে সমগ্রভাবে সেখানে পৌঁছে দিলেন। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় এসে একদিন মনে মনে আমি তাঁরই নিত্যসঙ্গী। পয়লা বৈশাখের সকালবেলা কিন্তু সেই পঁচিশ বছর আগেকার ছেলেমানুষী মন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রিয় লেখককে মুখোমুখি দেখতে। এতবছর যাত্রী স্পেশাল চালিয়ে নানা পাগলামির প্রতিকারে অভ্যস্ত সুবলবাবুও কিছুতেই আমাকে ঠেকাতে পারলেন না। শেষে বাধ্য হয়েই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন হোটেল কৈলাসে। আমাদের বাসস্থানের কাছেই স্টেশনের বাইরে গঙ্গাধর মহাদেবের মুখোমুখি হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি এপাশে ওপাশের ঘরে আরো লেখক সাংবাদিকদের পরিচিত মুখ। নানা বই-কাগজে লেখক-পরিচিতিতে এঁদের ছবি দেখে দেখে চেনামুখ হয়ে গেছে। কালকূটের ঘরে ঢুকে সুবলবাবু বলেন, 'এবারে হয়েছে তো? সমরেশ বসুকে দেখবে বলে এ ক'দিন পাগল করে দিচ্ছিল মশাই আমাকে।'

উত্তরে স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরা দেখে সাহস পাই। সুবলবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠি, 'মোটেই আমি সমরেশ বসুকে দেখবো বলে আপনাকে পাগল করিনি। ওঁকে তো কলকাতাতেই দেখা যায়। কুম্ভমেলায় আমি কালকূটকে দেখতে এসেছি।' সামনের টেবিলে পড়েছিল পরদিন আনন্দবাজারে প্রকাশিতব্য লেখার কিস্তি। বললাম, 'নববর্ষে আপনার সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্যই যখন হ'ল, অন্ততঃ এ লেখাটার প্রথম পাঠিকা হবার গৌরব আমি ছাড়তে রাজী

নই। ফিরে গিয়ে সব হিংসুটে বান্ধবীদের কাছে গল্প করতে পারবো।' মৃদু হেসে শ্লিপটা এগিয়ে দিলেন। লেখকের সঙ্গে আলাপে এর চেয়ে মধুরতর আপ্যায়ন আর কি হতে পারে! ফিরে আসতেই মণিকারা ঘিরে ধরলো, দেখা হ'ল? কিরকম দেখতে? তুই কি বললি, উনি কি বললেন, এটা সেটা হাজারো প্রশ্ন। আমি সত্যি কথাই বলি, কি বললেন, কি করলেন এসব তখন লক্ষ্যই করিনি। মনে মনে আমি তখন হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভ ছেড়ে কালকূটের সঙ্গে তিনদশক আগের প্রয়াগকুম্ভে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমনি করে এই জীবনেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবৎকালের সীমা পেরিয়ে কতো মহৎ মুহূর্তে উপস্থিত থাকার অনুভূতি ঘটে। মনে আছে কেদার-ভূমির প্রান্তে শঙ্করাচার্যের নির্জন মৌন সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছিলাম দুর্গম হিমপুরীতে দুর্জয় তরুণসন্ন্যাসী অমানুষী উৎসাহে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধারকল্পে তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু জৈবিক দেহ তো সেই দুর্বার মনের সঙ্গে পাল্লা দেয় না, বরং প্রতিরোধ করে। বত্রিশ বছরের অমিত-উৎসাহ তরুণসন্ন্যাসীর মরদেহ সেই তুষারভূমিতে সমাহিত হয়ে আছে আমাদের সেই কথা মনে করিয়ে দিতে। আজ গঙ্গাস্নানের পথে এই সবই ভাবছিলাম। কালকূট এবারে কুম্ভে এসে যোগের সময়ে ব্রহ্মকুণ্ডে যেতে পারেননি। এমন বাঁধভাঙা ভিড়ের চাপে ঝোলা কাঁধে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ানো এখন তাঁর নিষেধ। নিয়ন্ত্রিত-পরিবেশ ঘরে সাবধানী আরামের গণ্ডির মধ্যে বন্দী হয়েও তাঁর অভিযাত্রী মন হয়তো বাধা পায় না, এ প্রতিভার অলৌকিক ক্ষমতা। কিন্তু আমরা যে সাধারণ মনের মাপকাঠিতে ইটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েই থেমে যাই। বাধা পেয়ে ফিরে আসি। মন গুটিয়ে ফিরে আসি ফের শামুকের খোলের মধ্যে। তাই তো বাধা এড়িয়ে বেরিয়ে পড়বার ডাক শুনলেই উথালপাথাল করে মন। ঘরোয়া যত্নের নিত্যদিনের হাতপায়ের গয়নাকে মনে হয় অসহ্য শেকল। ভোলাগিরির ঘাটে শেকল ধরে ডুব দিতে দিতে অজান্তেই

হেসে ফেলি। ওধার থেকে অরুণদা ধমকে ওঠেন, 'এ মেয়েটা পাগল নাকি, আপন মনে হাসে কেন?' বলার সুরে বুঝি, এ পাগলামি আজ ওঁর নিজের মনেও ভর করেছে। তাকে সরিয়ে দিতেই আমা'ক এই ধমক চমকের ঘটা। পরের ঘরের ঝিকে মেরে মনের মোহের ঝোঁকে শোধরানো। এখানে এসেছি আজ সাতদিনের বেশী হয়ে গেছে। রোজ দুবেলা গঙ্গার ঘাটে আসি। স্নান করি, বসে থাকি, চেয়ে থাকি। গঙ্গাকে ঘিরে, গঙ্গাকে নিয়েই এ ক'দিন কাটিয়ে দিলাম। গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর—উত্তরকাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী—অনেক রূপে অনেক ঋতুতে গঙ্গাকে দেখেছি। কিন্তু সে দেখা যেন দ্বারকাধীশের ঝাঁকি-দর্শন। চোখ ভরে নিয়ে মনের দোরগোড়ায় পৌঁছবার আগেই পর্দা টেনে দেওয়া। এমন নিশ্চিন্তে নিরিবিলি বসে মন দেওয়া নেওয়ার অবসর পাইনি। একদিন স্নানের জন্য দশদিন বসে থেকে সময় নষ্ট হওয়ায় বিরক্ত হচ্ছিলেন অরুণদার মতো যাঁরা খুব ব্যস্ত, অনেক কাজের লোক। আসলে কিন্তু এই দশদিন বসে থাকাতেই হ'ল আসল কাজ। যোগের সময় হুড়োহুড়ি করে যখন ডুব দিয়েছি কোন কথাই মনে পড়েনি। কতদিন ধরে কত স্তোত্র মন্ত্র ঠিক করা ছিল। কতজনের নামে ডুব দেওয়ার কথা ছিল। সেসময় সব কিছু মুছে গিয়ে মন যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় বাণীদির গুছিয়ে দেওয়া ফল-পয়সা সব কাপড়ের থলিতে ঘুরে আবার ঘরেই ফিরে এল। এখন আবার আস্তে আস্তে মোছা স্লেটে আঁকিবুকি পড়ছে। এ-কথা সে-কথায় মন ভরছে। চঞ্চল জলে পূর্ণিমার ছবি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়। পূর্ণতার ছবি পুরোপুরি ফোটাতে হলে চঞ্চল মনের একটু স্থির হওয়ার অবসর অবশ্যই চাই। এজন্যই পুরো একমাস ধরে মেলাক্ষেত্রে কল্পবাসের বিধান। আজ বছরের প্রথম দিনে জাহ্নবীকে করজোড়ে প্রণাম—

বিষ্ণু পাদার্ঘ সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথ গামিনী
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবী।

শ্রদ্ধয়াভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবিজাহ্নবী।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুণীহিমাম ॥

সেই অমলিন কর্পূরধবল অমৃতঅম্বুতে অবগাহন করে অঞ্জলি ভরা গঙ্গাজল নিয়ে গঙ্গাকেই উৎসর্গ করলাম—

ওঁ সত্তঃ পাতকসংহন্ত্রী সত্তোদুঃখবিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি ॥

বাণীদি স্নান-তর্পণ শেষে ঘাটে উঠে ভিজে কাপড় নিংড়োচ্ছে নিংড়োতেও মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। জলে নামার আগে আজ একখানা ধোলাই করা নতুন থান পরেছেন। মণিকা বললো, 'বাণীদি, কাপড়টা ঘোলা জলে একেবারে যে নষ্ট হয়ে গেল। নববর্ষের দিন চান করে নতুন কাপড়টা পরলেই তো হ'ত'। মন্ত্রপাঠ এতক্ষণে শেষ হয়েছে। গামছা পাকিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বাণীদি বলেন, 'এই কাপড়ের জলও যে তর্পণে লাগে। বছরের প্রথম দিনটা—পূর্বপুরুষের মুখে দেব—তাই নতুন কাপড়খানা পরে নিলাম'। কাপড়ের জল তর্পণে লাগে—এরকম কথা তে কখনো শুনিনি। বাণীদি বলেন, 'বংশে যাঁদের পুত্রসন্তান ছিল না তাঁরা কাপড় নিংড়ানো জলেরই অধিকারী—

ওঁ যে চাস্মাকম্ কুলেজাতা অপুত্রা গোত্রিনো মৃতা
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্ ॥

মন্ত্র শুনতে শুনতে মনটা ভার হয়ে উঠলো—সেই বাল্যবিবাহের দিনে নিষ্পাপ ছোট ছোট কত বাল্যবিধবা—একাদশীর দিনে জলটুকুও মুখে না দিতে পেরে হয়ত তৃষ্ণায় কতজনের প্রাণ গেছে। আবার মৃত্যুর পরেও যে শাস্তির শেষ তা নয়। পুত্রহীনার জলগণ্ডূষেও অধিকার নেই। কাপড় নিংড়ানো জলের ফোঁটা সেই অনন্ত তৃষ্ণার যন্ত্রণাই শুধু আরো বাড়ায়।

আজ অশোকষষ্ঠী। বাসন্তীপূজার অধিবাস। বাণীদির আজও ফলাহার। তাই ঘরে ফেরার তাড়া নেই। স্নান করে উনি গেলেন

কনখলের দিকে দক্ষেশ্বর শিব দর্শন করতে। সেখানে আবার হয়তো একদফা অবগাহন হবে। পথে আসতে আসতে বলছিলেন যে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্তঘাট, দক্ষেশ্বর ও বিল্বকেশ্বর—এই চারটি স্থানে অবগাহন করলে মানুষ সর্বপাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে জন্মান্তরচক্র থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ভাবছিলাম যে কুম্ভযোগে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করে পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি তো হয়েই গেছে। তবে আর আবার এই ঘুরে ঘুরে পণ্ডশ্রম কেন। সাহস হ'ল না! বাণীদির আজ চারদিন ধরে একটানা ফলাহার চলছে শুক্রবার স'ন্তোষী মা, শনিবার নীল, রবিবার ঘট সংক্রান্তি আর আজ অশোকষষ্ঠী। শুনছি কাল দুপুরে একবার ভাত খেয়ে গায়ে একটু জোর করে নিয়ে পরশু একেবারে নীরম্বু হবে—অন্নপূর্ণাপূজার অষ্টমীর উপবাস। আমার মাসীমাকে দেখেছি ষষ্ঠী-টষ্ঠী সবই করতেন —কিন্তু করতেন খুবই লোভনীয় ভাবে। উপোস মানে ভাত না খাওয়া। লুচি, আলুরদম, ছানার ডালনা, রাবড়ি ইত্যাদি সহযোগে সেই 'উপোসে' যোগদান করার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকতাম। মাসীমা বলতেন, পুজো পার্বণের দিনে নিজের ভেতরের মহাপ্রাণীকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। সে ও তো ঈশ্বরেরই অংশ। তাকে তৃপ্ত করেই উপোস পালন করতে হয়। বাণীদি এ ব্যাপারে বৌদ্ধ মতে বিশ্বাসী। মাসীমার মতো রাজসিক উপোস নয় আবার নির্জলা থেকে নাড়ী শুকিয়ে শুয়ে পড়াও নয়। মধ্যপন্থায় সামান্য ফল-জল খেয়ে শরীরটাকে ধর্মাচরণের উপযোগী করে চালু রাখা। বাণীদি এসব ব্যাপারে সত্যিই খুবই প্রাকটিক্যাল। গোময়ের বিকল্পে ঘুঁটে ভিজিয়ে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। অমরনাথে উনি নাকি বেবীফুডের টিন নিয়ে গিয়েছিলেন। অমরগঙ্গার পবিত্র বারিতে গুলে নিয়ে মহাদেবের মাথায় দিয়েছেন। এমনি গুঁড়ো দুধ না নিয়ে বেবীফুড কেন জিজ্ঞেস করায় বললেন যে ওটা ঠাণ্ডা জলেও সহজেই গুলে যায়। সবই ভালো। সব কথাই খুবই যুক্তিযুক্ত।

শুধু যদি ওঁর মেজাজটা এত অযৌক্তিকভাবে সহজদাহ্য না হত। পটকা মেশানো ফুলঝুরির মতো সুন্দর আলো ছড়িয়ে জলতে জলতে হঠাৎ এক-একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মুহূর্তে সব যুক্তি বুদ্ধি কোথায় যে উড়ে যায়। এজন্য ওঁর কাছে শাস্ত্রের বিচিত্র কাহিনী শুনতে ভাল লাগলেও বেশীক্ষণ সঙ্গী হতে ভয় পাই। স্বয়ং পঞ্চপাণ্ডবই জতুগৃহের অনিশ্চয়তা বেশীদিন সইতে পারেননি, আমি তো কোন ছার।

কালকের অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে আরো খবর পাওয়া গেল আজ। এত সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—কাল থেকেই কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কুম্ভমেলার অপ্রতিরোধ্য ভিড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। কুম্ভস্নানের পথে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর এ যেন এক ঐতিহ্য তৈরী হয়ে গেছে। ১৯৫৪-র প্রয়াগ কুম্ভমেলার ব্যাপক দুর্ঘটনার বিভীষিকা বহু প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে এখনও জীবন্ত রয়েছে। জীবন্ত আছে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' কালকূটের মরমী বর্ণনায়। এই বর্ণনা কুম্ভমেলাবিষয়ক সমস্ত স্মৃতিকথারই অঙ্গ। পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হরিদ্বার কুম্ভমেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'কিছু দূরে দেখিলাম এক স্থান ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ভিতরে অনেক গুলি শব রহিয়াছে। কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবক শব সনাক্ত করিবার জন্য চোঙা মুখে দিয়ে চীৎকার করিতেছে।' তারও পূর্ববর্তী পূর্ণকুম্ভের বর্ণনা দিয়েছেন গোবিন্দশঙ্কর সর্বাধ্যক্ষ। সেবারে হরিদ্বার কুম্ভে প্রায় 'তের-চোদ্দ লক্ষ স্নানার্থীর আগমন' হয়েছিল। ভিড় সামলাবার জন্য স্টেশন থেকে ব্রহ্মকুণ্ড যাবার পথের মাঝে মাঝে কাঠের খুঁটি পুঁতে গেট করে দেওয়া হয়। জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী ধর্মশালার দোতলার ছাতে দাঁড়িয়ে থেকে সেই গেটগুলি সময়মতো খোলা ও বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ

করেন। এবং এত তৎপরতার সঙ্গে করেন যে এক একটি গেটের সামনে কাউকে ১৫।২০ সেকেণ্ডের বেশী অপেক্ষা করতে হয়নি। 'যাহারা ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্তী শেষ গেট অতিক্রম করিত তাহারা ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া স্নান করিয়াই দক্ষিণদিকের প্ল্যাটফরম দিয়া বাহির হইয়া গঙ্গার উপরিস্থ অস্থায়ী পুলের উপর দিয়া গঙ্গার পরপারে চলিয়া যাইত'; আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেও গঙ্গার ওপরে অস্থায়ী পুল, একমুখী চলাচল ব্যবস্থা, গেট করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি সেকালের পরাক্রান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও পুরোপুরি দুর্ঘটনা-নিবারণ সম্ভব হয়নি। 'তথাপি লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে চাপা পড়িয়া সাধুসন্ন্যাসীদিগের স্নানের পূর্বে কতকগুলি লোক মারা গিয়াছিল।'

এই পঞ্চাশ বছরে সভ্যতা কতখানি এগিয়ে গেছে। মানুষ নির্বিঘ্নে গ্রহান্তরের মাটিতে বিচরণ করে আসছে। অথচ এককোটি মানুষের সমাবেশকে নির্বিঘ্ন করতে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এত প্রচেষ্টা। তবে কি মানুষ যতই চেষ্টা করুক, দৈবকে রোধ করার ক্ষমতা তার নেই? ঘটনার বিবরণ জানার পর মনে হ'ল, দৈব তো মানুষের মধ্য দিয়েই কাজ করে। মানুষের স্বভাব, তার চরিত্রের অহং-ই নিয়তি হয়ে মানুষকে আঘাত হানে। এবারে কুম্ভমেলার আগে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সমস্ত বিধিব্যবস্থা তদারক করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে বিশিষ্ট কোন মানুষ যেন কুম্ভস্নানের সময়ে না আসেন। কিন্তু তাই এসেছিলেন তাঁরা। এসেছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং, বিহারের রাজ্যপাল ভেঙ্কট সুব্বাইয়া আর মুখ্যমন্ত্রী বিন্ধ্যেশ্বরী দুবে। সঙ্গে ছিলেন এঁদের পরিবার আর আমলাবর্গ। এছাড়া এসেছিলেন এমনি বিশেষ ব্যবস্থা করে আরও কয়েকটি রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের বেশ কিছু হোমরা-চোমরারা। এঁদের জন্য ব্রহ্মকুণ্ডে সাধারণ লোকের চলাচলের সেতুগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল

রাত্রি তিনটে থেকে তিন ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে। ফলে সেতুপথের মুখে অপেক্ষমান অগ্রসরণশীল জনতার চাপ বাড়তেই থাকে। পেছনের অধৈর্য মানুষ ক্রমাগত এগোতে চেষ্টা করেন সামনের দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দেওয়াল ভেদ করে। সেই প্রচণ্ড চাপে একসময় শেষে ধসে পড়ে পন্থদ্বীপের সংকীর্ণ সেতুমুখের প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ভিড়ের চাপে থুবড়ে পড়া মানুষগুলির উপরে এসে পড়ে আরও মানুষ, আরও মানুষের দেহ। পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় প্রায় দুশো হতভাগ্য অমৃতযাত্রী। না, কুম্ভে যাঁরা মারমুখিতার জন্য বিখ্যাত, সেই নাগা সাধুদের কোন সংস্রব ছিল না এ দুর্ঘটনার সঙ্গে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বিধি অগ্রাহ্য করার কোন প্ররোচনা ছিল না সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। সেতুমুখের পুলিশ ও শৃঙ্খলারক্ষাকারীরাও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং গঙ্গাসভার পরিচালকদের নির্দেশ মান্য করেছে যথাসাধ্য। তবে এ দুর্ঘটনার দায়িত্ব কার, কি তার প্রতিকার, কি তার প্রতিবিধান—সে কথা জানতে অপেক্ষায় রইলো এইসব হতভাগ্য মানুষের আত্মা।

বারো

কুম্ভের পুণ্যস্নানের পর্ব সারা হয়ে গেছে, এবার মেলার কেনাকাটার পালা। আমাদের বাসাড়েরা সবাই পর্বতপ্রমাণ বাজার করে আনছেন এবং বড় ঘরের ফরাসে মেলে ধরে তুলনামূলক আলোচনায় তৃপ্ত হচ্ছেন। বাজার পর্বতপ্রমাণ হবার কারণ, হরিদ্বারের মূল ক্রেতব্য জিনিস হ'ল কম্বল। নানা দামের, নানা রঙের, নানা কিসিমের কম্বল থরে থরে সাজানো রয়েছে দোকানে। পঁচিশ থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত কম্বল দেখলাম আমাদের এই ক'জনেরই সংগ্রহের মধ্যে। মণিকা তিন-চারদিন ধরে বহু দোকান

ঘুরে একটি হাল্কা তুলতুলে সুখস্পর্শ কম্বল কিনে এনেছে। সেটা বার বার দেখে ও দেখিয়ে তার আর তৃপ্তি হয় না। অরুণদা তাঁর নার্সিংহোমের জন্য একঘন্টার মধ্যে একবারে পঁচিশটা বাঘা কম্বল নিয়ে এলেন। ঘরের একধারে স্তূপ করে সাজানো রয়েছে সেগুলো। ইরাদির ছেড়ে যাওয়া বাক্স-বিছানার সঙ্গেও রয়েছে চারটে কম্বলের প্যাকেট। তাছাড়া একটা দুটো করে কম্বল তো প্রায় সকলেই নিয়েছেন। এই বমাল মানুষগুলির হাওড়া পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাত্রীস্পেশালের। সুবলবাবু চারদিকের ক্রমবর্ধমান কম্বলস্তূপ দেখতে দেখতে ক্ষেপে গিয়ে শেষে ঘোষণা করে দিলেন, 'আসার সময়ে যার যতটা মাল ছিল, ততটা ওজনের মালই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার। বাকীটার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে।' শুনে অভ্যাসমতো বাণীদির দিকে তাকাই। তিনি তখন জপে বসেছেন, কথা বলবেন না। কিন্তু কানে শুনতে বা চোখে দেখতে তো বাধা নেই। উত্তরে শুধু চোখদুটি তুলে একবার তাকালেন। হ্যাঁ, একবার দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। সুবলবাবুর সবল কণ্ঠস্বর উদারা থেকে একেবারে খাদে নেমে এল—'হ্যাঁ তবে এবারে অবশ্য আমরা সকলের সব মালই নিয়ে যাবো। কারণ এবার তো আর সাধারণ বেড়ানো নয়, এ যে কুম্ভ। কুম্ভের স্মৃতি তো কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে হবেই।' অরুণদা এতক্ষণ নির্বিকার বসে ফাইভ ফিফটি ফাইভের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিলেন। দুষ্টু হাসি হেসে কানের কাছে মুখটা নামিয়ে বললেন, 'তুমি তো কম্বল কিনলে না। কাল গঙ্গার ধার থেকে মাপমতন একটা বোল্ডার তুলে এনো। কুম্ভের স্মৃতি তো একটা নিতে হবেই, আর সুবলেরও ওজন নিতে যখন আপত্তি নেই।' যথাসাধ্য কানের কাছে মুখ আনলেও বোল্ডার ঠিক জায়গায়ই হিট্ করলো। সুবলবাবুর ক্ষিপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি একটু পিছিয়ে বসি। অরুণদার পেছনে বসা আরতিদি কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'মিতু, তোমার স্ফটিকের মালাটা একটু দেখাও তো।' সুটকেস থেকে মালাটা বের

করে হাতে নিয়ে মনে হ'ল একবার গুনে দেখি পাথর ঠিক একশো আটটাই আছে তো! একি গুনে যে একশো ন'টা হচ্ছে। আবার গুনি। একটা বেশি কেন, জপে ভুল হয়ে যাবে না! আরতিদি বললেন, 'একশো ন'টাই তো থাকতে হয়। ওই মাঝের সবচেয়ে বড় যিনি মধ্যমণির আকারে, তিনি হচ্ছেন গোপীমণ্ডলের মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণ।' তাঁর দুপাশের অল্পবড় চারজন হলেন প্রধানা অষ্টসখী। আর বাকীরা হলেন একশো জন গোপিনী। মধ্যমণিকে প্রণাম করে জপ শুরু করতে হয় পাশের পাথরটি থেকে। আবার মধ্যমণির পাশে পৌঁছে পিছন ফিরে ঘুরে আসতে হয়, তাঁকে অতিক্রম করতে নেই কখনো।'

'অষ্টসখী, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই তো আছেন—রাধা তাহলে কই?' মালা হাতে নিয়ে আমাদের রাধারানীর প্রশ্ন।

'রাধা হচ্ছে সে-ই যে জপ করে, যার হাতে মালা থাকে সে-ই আরাধিকাই রাধা'—মণিকা হেসে বলে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আমরাও হেসে উঠি। এ ক'দিনে মণিকার সঙ্গে রাধার বেশ জমে গেছে। মণিকার প্রগল্ভ গলায় যখন তখন গেয়ে ওঠা গানে গলা মিলিয়ে রাধারও সঙ্কোচ কেটে গেছে। চোখের মেঘলা ছায়াটা কেটে গিয়ে হাসছে ঝলমলে রোদ্দুর। 'আমার একটা রুদ্রাক্ষের মালা নিতে হবে'—বাণীদি জপ সেরে পুজোর জিনিসপত্র রাখতে রাখতে বলেন।

'কিন্তু রুদ্রাক্ষ চিনবেন কি করে, চারদিকে সবই তো দেখছি কুলের বীচির ছড়াছড়ি।'

সত্যি এই বাড়বাড়ন্ত কটেজ ইণ্ডাস্ট্রীটার কথা এবারে হরিদ্বারে না এলে আমাদের অজানাই থেকে যেত। চারপাশে অসংখ্য রুদ্রাক্ষ—সাধুদের গলায়, বাহুতে, সচ্ছল শেঠজীর সোনার হারে, পথের পাশে বিছানো পসরায় সর্বত্রই রুদ্রাক্ষের ছড়াছড়ি। কিন্তু কিনতে যান, ঘরে এনে যাচাই করে দেখবেন বিচিত্র সব ফলের

বীচি। রুদ্রাক্ষের গায়ে পলের ডিজাইন অনুসারে দাম বাড়ে, কমে। পল যত কম হবে তার কর্মকারিতা তত বেশী। সাধারণতঃ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষই চারপাশে বেশী দেখা যায়। দাম কম, পাওয়াও যায় বেশী। এজন্য সেগুলিতে ভেজালের সংখ্যাটা কম। সবচেয়ে বিরল এবং সবচেয়ে মূল্যবান হ'ল একমুখী রুদ্রাক্ষ। এই মেলায় বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে যাঁরা একমুখী রুদ্রাক্ষ ভেবে বীচি বিশেষে নরুনসঞ্চালনের দ্বারা প্রস্তুত শিল্পবস্তু কিনেছেন এক একটি একশো টাকা দিয়ে। আমার জেঠিমা গলার হারে রুদ্রাক্ষ পরতেন কবিরাজমশাইর নির্দেশে। হৃদরোগের পক্ষে নাকি রুদ্রাক্ষ বিশেষ উপকারী। কাউকে কাউকে চন্দনের মতো রুদ্রাক্ষ ঘষেও খেতে দেখেছি। অবশ্য এই পুণ্যস্থানে সেকথা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এখানে রুদ্রাক্ষ দৈবীশক্তির আধার—যোগীবিভূষণ, পবিত্র মাঙ্গলিক। রুদ্রাক্ষ অর্থে রুদ্রের অক্ষিপাতে যার সৃষ্টি। কথিত আছে, একসময় ত্রিপুরাসুর নামে দৈত্য মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে। তপস্যার দ্বারা আশুতোষ শিবকে সন্তুষ্ট করে শিববরে বলীয়ান হয়ে সে দেবতাদের ওপর মহা অত্যাচার শুরু করে দেয়। দেবতারা কাতর হয়ে এসে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর শরণ নেন। মহেশ্বর তখন ধ্যানমগ্ন। অনন্যোপায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তখন বাধ্য হয়ে অসময়ে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করলেন। অসময়ে ধ্যানভঙ্গ হয়ে এই বৃত্তান্ত জেনে অসহ্য ক্রোধে মহাদেবের ত্রিনয়ন বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তিন বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল মাটিতে। এই তিন বিন্দু অশ্রু থেকেই সৃষ্টি হ'ল তিনজাতীয় রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের। দক্ষিণ ভারতে কুম্ভকোণম তীর্থের কাছেই দরসুরাম নামে জাগ্রত শৈবতীর্থ অবস্থিত। কথিত আছে যে এই মহাতীর্থেই শিবাশ্রুসম্ভূত রুদ্রাক্ষবৃক্ষের উদ্ভব। এখন অবশ্য হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশ ব্যতীত এই বৃক্ষের সন্ধান কমই পাওয়া যায়। আরতিদি বললেন, 'আমি দেখেছি এগাছ, কনকদুর্গার জঙ্গলে।'

'কনকদুর্গা—সে আবার কোথায়?'

'কনকদুর্গা আছেন চিল্‌কীগড়ে, গিধনীর কাছে।' অরুণদার এসব গল্প নখদর্পণে। বলতেও পারেন বড় সুন্দর করে। ঝাড়গ্রামের পরের স্টেশন হ'ল গিধনী। স্টেশন থেকে সোজা রাস্তা প্রায় মাইল চা'রক গিয়ে চিলকীগড়ের রাজবাড়ি পেরিয়ে সোজা নেমে গেছে ডুলন নদীর বুকে। নদীতে জল বেশী নেই। পায়ের পাতা অথবা বর্ষায় হাঁটু ভিজিয়ে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় নদীর মাঝখানে দ্বীপের আকারে জেগে ওঠা আরণ্য ভূমিখণ্ডে, কনকদুর্গার থানে।' ক্রমোচ্চ টিলার আকারে গঠিত এই দ্বীপভূমিতে নানা দুষ্প্রাপ্য ওষধি বৃক্ষের নিবিড় জঙ্গল। কালো'মুখী'লাল কুঁচফলের গুচ্ছ চুণিমণির অলংকারের মতো সাজিয়ে রেখেছে চারদিকের ঝোপঝাড়। তার মাঝে মাঝে নিম, বেল, আমলকী, বয়ড়া, হরিতকী, রুদ্রাক্ষের গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বীপের একমাত্র স্থায়ী অধিবাসী অসংখ্য বানরকুল নির্বিঘ্নে সেই সব বৃক্ষের ভোগদখল করছে সারাদিন। মনে হয় প্রাচীনকালে কোন সাধকপুরুষের আসন ছিল এই অঞ্চলে। তিনিই সাধনার প্রয়োজনে এইসব দুষ্পাপ্য বৃক্ষ সংগ্রহ করে এখানে রোপণ করেছিলেন

শুনতে শুনতে ভাবছিলাম আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে এরকম কত আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। সে গল্প শুনতে আসতে হ'ল এই এতদূরের কুম্ভমেলায়। মেলা মানেই তো তাই। মিলে-মিশে দেওয়া-নেওয়া কত জানা-অজানায়। এইরকমভাবে এখানে না মিললে তো জানতেও পারতাম না বাণীদিকে। জানতাম না ইরাদি, আরতিদি আর মণিকাকে। এমনকি এতদিনের জানা রাধাকেও নতুন করে জানতে আসতে হ'ল এই মেলায়। মণিকার সঙ্গে জার্নালিস্ট দম্পতির সঙ্গী হয়ে আজ সকালে পেরেকবাবাকে দেখে এসেছে রাধা। গঙ্গার তীরে সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণাগ্র পেরেক-গাঁথা একটি তক্তা বাবার শয্যা। পায়ের খড়মটিও তেমনি সূচীমুখ, কণ্টকাগ্র। নির্বিকার মুখে এই কাঁটার ওপরেই চলে তাঁর চলা-ফেরা-শোওয়া-বসা—এককথায় সমগ্র দিনযাপন। মা পৃথিবীর স্নেহস্পর্শ থেকে সর্বাংশে নিজেকে বিচ্যুত

করে এই এক বিচিত্র সাধন তাঁর। জানি না এর তাৎপর্য কি। সাধনার কত পথ, কত স্তর, কত রহস্য আছে। একান্ত অজ্ঞ, অনধিকারী আমি সে সব গূঢ় তত্ত্বে। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে যদি ঈশ্বর বলে কোন সত্তা থাকেন, তিনি যদি মানুষের পরমাত্মীয়ই হন, তাহলে এই নিরর্থক কষ্টস্বীকার, এই অমানবিক দেহযন্ত্রণার ভোগ তাঁকে নিশ্চয়ই তৃপ্তির পরিবর্তে যাতনাই দেয়। শুনেছি চড়কের গাজনে সন্ন্যাসীরা পিঠে বাণ ফুঁড়ে ঘুরপাক খান কোথাও আবার নিয়ম আছে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার। পঞ্চতপা করতে হয় গ্রীষ্মকালে চারধারে চার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে সারাদিন জ্বলন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে থেকে। মনকে একান্তভাবে তদ্গত করাই যাদ এর উদ্দেশ্য হয়, তা কি অন্য কোনো স্বাভাবিকতর উপায়ে করা যায় না। মানুষের মনকে এতখানি দুর্বিনীত, দুঃশীল ভাবতে আমি রাজী নই। তবে সংসারে দেখেছি কেউ কেউ অকারণে দুঃখ সহ্য করেই একধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আত্মাবলোপেই তাঁদেব আনন্দ। আমার মাসীমার ভাষায় নিজের ভিতরের মহাপ্রাণীটাকে টুঁটি টিপে মেবে ফেলে অন্য প্রাণীর ভোগে লাগিয়ে পুণ্য করেন তাঁরা। আসলে আত্মহত্যার পাপ লাগে তাঁদের। গত দুবছব ধরে রাধার দিকে তাকিয়ে এ কথাটা আমার বার বার মনে হ'ত। এবারে এলাহাবাদ থেকে শূন্যবেশে ফিরে এসে সে মন থেকে সব ভয়ের ছাবি মুছে দিয়েছে আশা যখন ছিল তখন আশঙ্কাও ছিল। যার সম্বল কিছুই নেই তার আব কি খোওয়া যাবে! তার কাছে পরিবর্তন মানেই প্রাপ্তি, শূন্যতার শুধু পূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

আজ একটু লছমনঝুলা হৃষীকেশেব দিকে ঘুরে আসার ইচ্ছে। আনন্দ বললেন, 'ট্রেনেই চল। পথে বীরভদ্র স্টেশনে নেমে আই. ডি. পি. এল্-এর অফিসে একটু দেখা করে যাবো, একটা বিল বহুদিন ধরে আটকে আছে।' অর্থাৎ পরমার্থের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সন্ধানও যদি করা যায়, মন্দ কি। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে

আছে। কিন্তু কী ভিড়, কী ভিড়। কোনো কামরার কাছাকাছি যাবার উপায় নেই। অসংখ্য লোক পাদানিতে একটা মাত্র পা স্পর্শ করে ঝুলে রয়েছে। অর্থাৎ ট্রেন ছাড়লে শেষমুহূর্তে লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই। আগে থেকেই ঝোলার জায়গাও রিজার্ভ করা। এইবারে বেশ কুম্ভমেলায় এসেছি এসেছি বোঝা যাচ্ছে। এই ট্রেনে চড়া অবশ্য সম্ভব নয়। তবে দেখেই মালুম হচ্ছে তীর্থপথের কৃচ্ছ্র কাকে বলে। কোথায় লাগে আমাদের কলকাতার ট্রামবাস। শেয়ালদা সেকশনের লোকাল ট্রেন তো এর কাছে শিশু। শুনলাম অসংখ্য পুণ্যার্থী হৃষীকেশ, মুনী-কী-রেতী প্রভৃতি অঞ্চলে বাসা নিয়ে রোজ হরিদ্বারে আসা যাওয়া করছেন। এই ট্রেনে রোজ যাওয়া আসা—শুনেই বিষম লাগে। তাছাড়া উত্তরকাশী প্রভৃতি জায়গা থেকে যাঁরা স্নানে এসেছিলেন তাঁরাও যোগশেষে ফিরছেন এখন—কাজেই আমাদের মতো অ্যামেচারদের পক্ষে এ হেন দুর্ভেদ্য তীর্থযাত্রী স্পেশালে চড়ার আশা দুরাশা। আগেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। ভিড়ের ভয়ে যাত্রীস্পেশালের রিজার্ভ বগির আশ্রয় নিই আমরা—কোন সাহসে এসেছি কুম্ভের লোকাল ট্রেনের মহড়া নিতে! একেই বলে পিপীলিকার পাখা ওঠে ……। ট্যাক্সিতে বসে অবশ্য ব্যাপারটাকে উল্টে ব্যাখ্যা করি। আনন্দকে তর্জন করে বলি, 'ধর্মস্থানে এসে ওসব বিল-টিলের খোঁজ করতে গেলে এমনি ফল হয়। জান না, অর্থই হচ্ছে অনর্থ।' আরতিদি নিরীহ গলায় বলেন, 'ঠিক বলেছো। কেবল ট্যাক্সিওয়ালারাই সেকথা বোঝে না। কুম্ভ বলে দুগুণ ভাড়া চায়।' সত্যি, কাল সন্ধ্যায় স্টেশনের সামনে থেকে রামকৃষ্ণমিশন যেতে এক রিকশাওয়ালা দুজনের জন্য পঞ্চাশ টাকা চাইল। শেষে এক টাঙ্গাওয়ালা সস্তায় রাজী হ'ল—মাথা পিছু দশ টাকা। অর্থাৎ সে মোট সত্তর-আশী টাকা নেবে একটা ট্রিপে।

শুনেছি সাধুমহাত্মারা নাকি খেচরগামী হতে পারেন। পথের পাঁচালীর অপু আকাশে ওড়বার আশায় পারদ আর শকুনীর ডিম

খোঁজ করছিল। সেইরকম একটা কিছু পেয়ে গেলে মন্দ হয় না। কোন কোন দ্রব্যগুণসিদ্ধ সাধু নাকি পারদমিশ্রিত একরকম 'গুটিকা' তৈরী করতে পারেন—সেটি মুখে রাখলে মানুষ আকাশে উড়তে পারে। মধ্যপ্রদেশের দুর্দান্ত দস্যু তাঁতিয়া ভীল নাকি এরকম একটি গুটিকা'র অধিকারী হয়ে সমস্ত সরকারী নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে অনায়াসে ডাকাতি করে বেড়াত। একবার ওঁকার ঝাড়ীর গহন জঙ্গলে নর্মদা পরিক্রমারত বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজির প্রশ্নের জবাবে সে বলে যে, সাধু মহাত্মাদের কৃপাই তাঁর অবলম্বন। এক সাধুর প্রদত্ত গুটিকাবলে সে অতি দ্রুত চলতে, আকাশপথে চলতে এমনকি সকলের সামনে অদৃশ্য হয়েও যেতে পারে। এ-ও প্রায় তারকাসুরের কাহিনীরই অনুরূপ। স্বভাবকোমল সাধুদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করে নিজের অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করে নেওয়া। তবে এই গুটিকার সাহায্যে খেচরত্ব লাভ নিছক দ্রব্যশক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ গুটিকাটি হারিয়ে ফেললে তার ঐ শক্তিও সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে। প্রকৃত সাধু তার সাধনক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে এজাতীয় সমস্ত সিদ্ধিরই অধিকারী হন। মানুষের দেহরূপী কুম্ভ মৃত্তিকানির্মিত। সাধু তাকে সপ্তপ্রকার সাধনে পুড়িয়ে অমৃত উপলব্ধির উপযোগী করে নেন—

ষট্‌কর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা
প্রাণায়মাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষ মাত্মনি ॥

ষট্‌কর্ম অর্থাৎ ধৌতি, বস্তি, নেতি, লোলীকি, এাটক ও কপালভাতি দ্বারা শোধন, মুদ্রা (মহামুদ্রা, খেচরী মুদ্রা, যোনীমুদ্রা ইত্যাদি) দ্বারা দৃঢ়তা, প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লঘুতা, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় পদার্থের দর্শন ও সমাধি দ্বারা সেই পরম পদার্থের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এখানে হঠযোগের সোপানক্রমে রাজযোগের

মন্দিরে আরোহণের কথা বলা হয়েছে। সেই অলৌকিক মন্দিরের অন্তর্নিহিত দিব্য উপলব্ধি আমাদের সীমিত মানববুদ্ধির অগোচর। আমরা সেই লৌকিক সোপানপথের ধাপগুলি দূরে দেখেই হা-হুতাশ করি। সিঁড়ি ভাঙার সাধনা নেই, উদ্বাহুবামনের ফললোলুপ চিত্ত দুঃসাধ্যকে মুঠিতে ভরার স্বপ্ন দেখে।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ পর্যন্ত চোদ্দ মাইল রাস্তার দৃশ্য ভারী সুন্দর। ডাইনে মাঝে মাঝেই গঙ্গার উচ্ছল ঢেউ শস্যক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে যায়। বাঁয়ে দূরে পাহাড়ের সারি। লছমনঝুলা প্রায় চার মাইল দূর। কথিত আছে যে পুরাকালে রামানুজ লক্ষ্মণ রামজানকীর গঙ্গা পার হবার জন্য এখানে সেতু নির্মাণ করেছিলেন। তাই এ স্থানের নাম লছমনঝুলা। লক্ষ্মণজী ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কতটা কৃতবিদ্য ছিলেন জানি না। অন্ততঃ সাগর বন্ধনের অনুরূপ কোন নৈপুণ্য সেই ঝোলাপুলে ছিল না। ওপরে ও নিচে দুটি লোহার শিকল নদীর দুই পাড়ে পাহাড়ের গায়ে সংলগ্ন ছিল। ওপরের শিকল ধরে নিচের শিকলে পা রেখে এই তীব্র খরস্রোতা নদীগর্ভ পার হতে হ'ত। শেঠ সুরজমল যখন তাঁর জননীকে নিয়ে কেদার-বদরী তীর্থে রওনা হলেন, বৃদ্ধা জননী লছমনঝুলায় এসে সেই শেকলের সেতু দেখে পুত্রকে বললেন. 'তুমি আগে উপযুক্ত সেতু নির্মাণ করো তারপর আমি তীর্থে যাব।' জননী এপারে অপেক্ষায় রইলেন। ছয়মাসের মধ্যে লছমনঝুলার বর্তমান সেতু নির্মাণ করলেন মাতৃভক্ত পুত্র। কুম্ভ উপলক্ষে সেই সেতুর সমান্তরাল অনুরূপ আর একটি সেতু এবার তৈরী করা হয়েছে গীতাভবনের সামনে থেকে। আরেকটু দক্ষিণে আরও একটি অস্থায়ী ভাসমান সেতু সৈন্যবিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। অর্থাৎ এর আগে যেমন লছমনঝুলার পুল দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়ে গীতাভবন প্রভৃতি দেখে লঞ্চে এপারে এসেছি এবারে আর তা হ'ল না। সেতু থাকলে আর লঞ্চে সময় নষ্ট করতে কেউ রাজী নয়। ওপারে গিয়েও ভাল লাগেনি, এত

লোক, এত ভিড়, আর এত বেশী আধুনিক হয়ে গেছে সবকিছু যে কয়েকবছর আগের হৃষীকেশ-লছমনঝুলার স্মৃতি পদে পদেই ঠোকর খায়।

গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে গঙ্গার কিনারা থেকে প্রায় দু'শো গজের মধ্যেই পর্বতশ্রেণী শুরু হয়েছে। নদীতীর থেকে এই পর্বতের ঢাল পর্যন্ত অঞ্চল—লছমনঝুলা থেকে প্রায় দুমাইল পর্যন্ত কালীকমলী-ওয়ালা ট্রাস্টের অধীনে আছে। এখানে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক একটি ছোট সাধনকুঠিয়া তৈরী করে সাধুদের সাধনা করার জন্য থাকতে দেওয়া হয়। তাঁদের দু-বেলার আহার্যও ঐ ট্রাস্ট থেকেই দেওয়া হয়। সাধুরা নির্জনে স্বেচ্ছামতো সাধনভজনে দিন কাটান। এবাবে এসে দেখি সেই সাধনাশ্রমের নির্জন পটভূমি অন্তর্হিত। আগেকার পায়েচলা নিঃসঙ্গ রাস্তায় সারি সারি ফেরিওয়ালা বসেছে। কাঁচের চুড়ি থেকে মৃগনাভি, বরফজল থেকে বাটাটাপুরী সবই সচীৎকারে বিক্রি হচ্ছে। ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে বহু সাধুবেশীও রয়েছেন ক্রেতার ভূমিকায়। আর সেই নির্জন ছোট কুঠিয়াগুলির আকাবে সম্প্রসারণ ঘটেছে। মনুষ্যবসবাসের, আরও শুদ্ধ করে বললে সভ্যমানুষের বসবাসের পরিচয় তাদের চারপাশে। কে জানে কুম্ভ উপলক্ষে বৈরাগী সাধুদের ঘরেও অতিথিরা এসে উঠেছেন কিনা যেমনটি দেখা যায় পৌষমেলার সময়ে শান্তিনিকেতনে। বাসিন্দাদের চেয়ে বিদেশাগতেরাই মুখ্য হয়ে ওঠেন সে ক'টাদিন। সাধুদের ওইটুকু এলাকা ছাড়িয়েই হোটেল, বাজার, মন্দির, আশ্রমের এক সুসজ্জিত নগরীতে পৌঁছে গেলাম। একছুটে পেরিয়ে এলাম পথ। মাথার ওপরে চড়া রোদ। বিশ্রী—ভারী বিশ্রী লাগছিল সব কিছু। পথের ধারে হোটেল থেকে ডাকাডাকি, পসারীর 'আসল রুদ্রাক্ষ' এগিয়ে ধরা, বিদেশী রিপোর্টারের ক্যামেরার সামনে বাবাজীর তত্ত্বব্যাখ্যা—পৌরাণিক কুম্ভযোগের চিরন্তন চরিত্র হারিয়ে সত্যিকরেই মানুষের এক সাজানো মেলায় পৌঁছে গেছি। এর চেয়ে আমাদের কাছের

ঘাটে একলা গঙ্গাই ভালো।' দিনে রাতে কলকল করে একই কথা বলে। শোনার কান থাকলে শোনো—না চাইলে জোর করে শোনানোর মানুষী উৎসাহ নেই তার। কুম্ভমেলা মানুষের জন্য সত্যিই। কিন্তু মানুষ এখন এত বেশী হয়ে গেছে—পুঞ্জীভূত মানবমনের প্রবাহ এত প্রকট যে প্রকৃতির উচ্ছলিত অমৃতপ্রবাহ তার নিচে চাপা পড়ে যায়। যেমন অতলস্পর্শী পুষ্করিণীর ওপরে পানার দূষিত গাদে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত জীবনের প্রবাহ।

তের

আজ বাসন্তী অষ্টমী অন্নপূর্ণা পূজা। অষ্টমী সাড়ে নটা পর্যন্ত আছে। কিন্তু বাণীদির বিধান সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সেরে নিতে হবে। কারণ সে সময়ে আজ ব্রহ্মপুত্র স্নানের যোগ। ফল-নিশ্চিত ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। আর হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড তো সর্বতীর্থবারির আধার। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া নয় চললাম সকলে কাপড়-গামছা নিয়ে বাণীদির পিছু পিছু। আজ সকাল থেকেই রোদ নেই। মেঘলা করে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। বাণীদি বললেন প্রতিবার কুম্ভে অন্ততঃ একদিন বৃষ্টি নাকি হবেই। আরতিদি বলেন, 'মর্তলোকে যেমন আমরা এসেছি, এসেছেন সাধুমহাত্মারা, তেমনি অন্তরীক্ষে দেবতারাও এসেছেন এই পুণ্যস্নানে যোগ দিতে। দেবরাজ ইন্দ্রও আছেন সেই দলে। তাঁরই করুণা ঝরে পড়ছে বৃষ্টিধারায়'। ব্রহ্মকুণ্ডে আজকে জলের তোড় খুব। পাহাড়ে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। ঢল নেমেছে নদীতে। আর বাঁধের বাঁধনও এখন খোলা। অবাধে ধেয়ে আসছে তীব্র স্রোতের ধারা। তবে জল বেশী নয়, কোমর পর্যন্ত হবে। কিন্তু তার মধ্যেও স্থির হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। শেকলে দুহাত আটকেও এক জায়গায় সোজা থাকতে পারছি না—জলের তোড়ে

বাঁকিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আরতিদি বলেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডকে এজন্যই শাস্ত্রে ব্রহ্মনাল বলা হয়েছে। মৃণাল কি জলে স্থির হয়ে থাকতে পারে, স্রোতের বেগে সে এদিক ওদিক তো করবেই।' বাণীদি ওদিকে একমনে ব্রহ্মপুত্র-স্নানের পুণ্যসঞ্চয় করছেন—

'ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর।'

মণিকা চুপিচুপি বলে, 'বাণীদির কত পাপ জমা আছে বলোত? এত জায়গায় এত অব্যর্থ পাপমোচনের স্নান করেও হরণ হতে কিছু বাকী আছে নাকি এখনো?' সভয়ে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখি। উনি এখন গণ্ডূষে জল নিয়ে জলপান মন্ত্র বলছেন—

'ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস সমুদ্ভব
পিবাসি শোকসন্তপ্তোমামশোকং সদাকুরু॥'

বাণীদির আজ অষ্টমীর উপোস। শেষরাত্রে সন্ধিপুজো হয়ে গেলে ফলাহার। মণিকা বলে, 'দেখছো না পেটভরে সেজন্য সারাদিনের মতো জল খেয়ে নিচ্ছেন' বাণীদি পাড়ে উঠে মন্ত্র পড়ে কাপড় নিংড়ানো শেষ করে জিজ্ঞেস করেন, 'জলের কথা কি বলছো গো তোমরা?' আরতিদি বলেন, 'বলছিলাম আজকের দিনে এই ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান করা কি ভাগ্যের কথা।' গম্ভীরমুখে মণিকার পাশ থেকে তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে আসি। কি আবার বলে বসবে, সামলানো দায় হবে তখন। ফেরার পথে পাশে এসে রাধা বলে, 'কাল তোমায় বলতে ভুলে গেছি, মীরাদি, মায়াদিরা এসেছে। ভোলাগিরির আশ্রমে উঠেছে।'

'তাই নাকি, কোথায় দেখা হ'ল?'

'ওই কনখলের দিকে। বিকেলে কানুদার সঙ্গে গিয়েছিলাম মৌনী বাবাকে দেখতে।'

'কানুদাটা আবার কে?'

'বাঃ চেনো না নাকি? ওই যে জার্নালিস্ট ভদ্রলোক।' আর জবাব দিই না। সত্যিই তো, সঠিক ভাবে কাকেই বা আমরা চিনি। মণিকার রজতদা রাধার কাছে কানু হয় আমার তাতে কি করণীয় থাকতে পারে!

ব্রহ্মকুণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে এসে বাণীদি দেখান কুশাবর্তঘাট। হরিদ্বারে একমাত্র এখানেই পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়। মহর্ষি দত্তাত্রেয় যখন এই ঘাটে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতে বসেছিলেন তখন তাঁর সংগৃহীত কুশাদি গঙ্গার স্রোতে ভেসে যায়। ক্রুদ্ধ মহর্ষি তপঃ প্রভাবে স্রোতকে সংযত করে আবর্তিত করে কুশগুলিকে আবার ঘাটে ফিরিয়ে আনেন। সেই থেকে এই ঘাটের এই নাম। বাণীদি কাল দক্ষপুরীর ঘাটে স্নান করেছেন। মন্দিরের বিশাল হাতা পেরিয়ে নির্জন ঘাটটি দেখলে সত্যি ভাল লাগে। ঘাটের ওপর প্রকাণ্ড মহীরুহ দাঁড়িয়ে আছে ছায়া ফেলে। দক্ষকন্যা সতী কুমারী বয়সে এই ঘাটেই স্নান করেছেন, এই ঘাটেই তাঁর বিবাহের জল সইতে এসে পুরনারীরা কত কলরব করেছেন ভাবলে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। -বিশ্বাস্য একন্য নয় যে সে ঘটনা ঘটেছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে! অবিশ্বাস্য লাগে সেই পৌরাণিক বিশ্বাসের জগতে এত সহজে এসে পৌঁছে গেছি আমি। বিংশ শতকের কলকাতা থেকে যাত্রীস্পেশালের একটা টিকিট কিনেই এই টাইমমেশিনে - না শুধু টাইম নয়, টাইম অ্যাণ্ড স্পেস্ মেশিনে চড়ে বসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। শিব, সতী, জাহ্নবী সকলের সঙ্গে যেন দুবেলা ওঠাবসা করছি এ ক'দিন। সামনে আসেননি তাঁরা ঠিকই, কিন্তু আশেপাশেই যেন আছেন। হর-কা-প্যারীর সন্ধ্যার আরতির গোলমাল শেষ হলেই সায়ংসন্ধ্যা শেষ করে নির্জনে এসে বসবেন সতীসহ মহাদেব।

ভোলাগিরির আশ্রমের সামনে এসে মনে হ'ল তাহলে ওদের সঙ্গে দেখা করেই যাই। কলকাতায় কাছাকাছি থাকলেও কতদিন দেখা হয় না। আজ এই কুম্ভের টানে মনে মনে যেন কত কাছাকাছি

মিলেছি সকলে। বাণীদিও চললেন সঙ্গে। এই কাঁকে একবার ভোলাগিরিজীর সমাধিতে প্রণাম করে নেবেন। খুঁজতে খুঁজতে পেছন দিকে দোতলায় উঠে অবশেষে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এলাম। একদিকে স্তূপীকৃত চাল-ডাল-তরিতরকারীর রসদ। পাশে একটি একানে খাটে আড় হয়ে শুয়ে আছেন এক দীর্ঘকান্তি সন্ন্যাসী।

'তোমরা'

'আমি মীরাদি-মায়াদির বোন হই।'

তাড়াতাড়ি উঠে আদর করে হাতে প্রসাদ এনে দিলেন। প্রণামের আগেই প্রসাদ সাধুর আশ্রমে নয় যেন পরমাত্মীয়ের ঘরে এসেছি। ইনি স্বামী শংকরানন্দ। মীরাদির মুখে শুনেছি সত্যিকারের বড় স্নেহপ্রবণ ইনি। স্নেহ সন্ন্যাসীদেরই মানায়। কারও প্রতি বিশেষ মায়া নেই বলে স্নেহের নির্বাধ ধারা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। স্বামীজী বললেন, 'ঘুরে ঘুরে সব দেখে নাও যে ক'দিন আছো। এ সুযোগ তো সবসময় হয় না। বিল্বকেশ্বর দেখেছো?' বাণীদি বলেন, 'না বাবা, কিছুই তো দেখিনি আমরা। আপনি আমাদের পথ বলে দিন. আমরা প্রণাম করে আসি।'

স্বামীজী জানলায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখান রাস্তার ওপারে বিল্বকেশ্বরের পথ। বলেন. 'বেশী দূরে নয়, যাও এখনি দেখে এসো।' আমরা দুজনে সেই দিকেই চলি বাজারের বাঁধানো রাস্তা ছাড়িয়ে উঁচুনীচু ধুলোর পথ। ক্রমেই উঁচু হয়ে টিলার ওপরে উঠেছে। খানিকদূর গিয়ে গৌরীকুণ্ড স্নান সেরে পাণ্ডার কথামতো হাতে অর্ঘ্য নিয়ে মন্ত্র পড়ছেন কেউ কেউ। বাণীদি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখি বিনাবাক্যব্যয়ে জামাকাপড় খুলে আবার হাতের ভিজে কাপড়টা গায়ে জড়াচ্ছেন।

'ওকি করছেন, আবার স্নান করবেন নাকি?'

'এলাম যখন, এ সুযোগ ছাড়বো না। জানো না হরিদ্বারের মুখ্য চার ঘাটের মধ্যে বিল্বকেশ্বরও একটি। বাকী তিনটি আগেই

হয়েছিল। আজ এটিও হ'ল। তোমার দিদিদের খুঁজতে এসে তাঁদের জন্যে আমার বিল্বকেশ্বর দর্শন হয়ে গেল।'

দিদিদের দেখা না পেলেও তাদের পুণ্যের জোরে আরও পুণ্য যখন কপালে লেখা তখন ঠেকানোর তো উপায় নেই। চুপচাপ পাশের ছায়া ঘেরা বকুলগাছের নিচে বাঁধানো বেদীতে এসে বসি। ব্রহ্মকুণ্ডে একটু আগে স্নান করেই এই রোদে এতটা পথ হেঁটে আবার স্নান আমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে বাণীদির সঙ্গী হিসেবে ফাউ যেটুকু পুণ্য পাওয়া যাবে তাই লাভ। পাশ দিয়ে পাহাড়ী পথ উঁচু হয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। স্নান সেরে কতজন চলেছেন দেবদর্শনে। কেউবা পূজাশেষে নেমে আসছেন। গাছের ছায়ায় একটা বছর দশেকের ছোট্ট ছেলে বসে আছে পূজার ডালি সাজিয়ে। সামান্য কিছু ফুল, বেলপাতা আর নকুলদানার প্যাকেটের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটা কাঁচা বেল। বিল্বকেশ্বর বিল্বফলে তুষ্ট হন। একটা ডালিতেই একটু একটু সব কিছু সাজিয়ে নিলাম। ততক্ষণে বাণীদি স্নান সেরে এসে পড়েছেন। তুপা এগিয়েই আমার হাতের ডালিতে চোখ পড়ে।

'এ কি এক জায়গায় নিলে কেন? আমার পুজোটা কই?' আবার পিছিয়ে আসি। ততক্ষণে ছেলেটির সামান্য ডালি সব বিক্রি হয়ে গেছে।

'কি বুদ্ধিতে তুমি এক জায়গায় নিলে? জানো না দেবস্থানে অন্যের থেকে নিয়ে পুজো দিতে নেই?' ভয়ে ভয়ে বলি, 'না হয় পুরোটাই আপনি নিন না।' ওরে বাবা, তাও কি হয়—বাণীদি এবার চড়াগলাতেই ধমকে ওঠেন। দেবস্থানে এসে কিছুতেই ব্রাহ্মণকন্যাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করার মহা পাপ করবেন না। শেষে অবশ্য উনিই উপায় বের করেন। এক ডালি থেকেই দুজনে পুজো দেব। তার মূল্যস্বরূপ দশপয়সা আমাকে ওঁর থেকে নিতে হবে। তাই সই। দশ পয়সা কেন, উনি আমাকে দশটাকা দিলেও আমি

তক্ষুনি ব্যাগে ভরে নিতাম। বাপরে, দেবস্থানে এসে দুজনের জন্য একটি মোটে ডালি কিনে যে ভয়ানক অন্যায় করেছি, তার জন্য যে কোনো শাস্তি নিতেই আমি রাজী। খালি দেবী যেন রুষ্ট না হন। বাবা বিল্বকেশ্বর মাথায় থাকুন। আমি মনে মনে 'দেবী প্রসীদ, প্রসীদ' মন্ত্র জপ করতে করতে বাণীদির পেছন পেছন চলি। বাঁয়ে একটা ছোট গুহার মতো গর্ত। ফুলের মালা আর ধূপকাঠি সাজানো। পাথরের ওপরে লেখা আছে এখানে বসে সাধনা করেই ভোলাগিরিজী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর একটু উঁচুতে খানিক সমতল মতো জায়গায় মুখোমুখি দুই শিব বসে আছেন। বাঁদিকের শিবমন্দিরের ভিতরে আর ডানহাতি এক বাঁধানো বৃক্ষতলে। মন্দিরে দর্শন সেরে বিল্ববৃক্ষতলে বিল্বকেশ্বরের মাথায় কাঁচ বেল চড়ালাম। অঞ্জলি দিয়ে এবার প্রদক্ষিণ। আপনমনে এগিয়ে যেতেই বাণীদি পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন- 'ওকি করছো, উল্টো দিকে যাচ্ছ কেন?

'উল্টো দিকে মানে?'

'জান না, ঠাকুরকে সবসময় ডানদিকে রেখে প্রদক্ষিণ করতে হয়।'

'ও।' লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওদিকে চলি

খানিকটা যেতেই আবার 'থামো, থামো!'

'আবার কি হ'ল?'

'এবার পেছনে ফিরে এস।'

'কেন?'

'শিবকে অর্ধচন্দ্রের আকারে প্রদক্ষিণ করতে হয়। দক্ষিণ দিক থেকে অর্ধেকটা গিয়ে আবার পিছন হটে তাঁকে দক্ষিণে রেখেই ফিরে আসতে হবে।' এযে দেখি সেই মালাজপের মতো ব্যাপার। মধ্যমণির কাছে পৌঁছে আবার পিছু হটে ফিরে আসা। এবারে আর ভুল করি না। বাণীদির পিছনে পিছনে প্রদক্ষিণ সেরে আসি।

শুনেছিলাম এখানেই কোথায় যেন খয়ের গাছের জঙ্গল আছে। খয়ের গাছ কখনো চোখে দেখিনি। বোধহয় আমাদের বাংলাদেশের

দিকে হয় না। ইচ্ছে হ'ল একটু এগিয়ে দেখে আসি? বাণীদি চটে ওঠেন। 'এই দুপুর রোদে কি যে সব সৃষ্টিছাড়া সখ।' খয়েরের গাছ আবার দেখার কি আছে! যেখানে পুণ্যের কোন আশা নেই বাণীদি তার মধ্যে নেই। অর্থাৎ ওঁর ইহকালের সব খরচাই আসলে পরকালের ইনভেস্টমেন্ট। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে বাড়িমুখো রওনা করিয়ে দিয়ে সামনে আর একটু এগিয়ে দেখি। কোথায় জঙ্গল আর কোথায় কি! চারদিকে শুধু ধূসর আর সাদা পাথরের স্তূপ। বোধহয় পাথর কেটে নিয়ে নিয়ে একধারে পাহাড়ের খাদের মতো তৈরী হয়েছে। আর একদিকটা খাড়া। সেই খাড়া দেওয়ালের কুলুঙ্গীর মতো দূর থেকে দেখা যায় ছোট্ট একটা গুহা। পায়ে চলা পথের নিশানা ধরে আর একটু এগোলে দেখা যায় গুহার মধ্যে গেরুয়া রঙের কম্বল বিছিয়ে চোখ বুজে এক সাধু বসে আছেন। গেরুয়া কম্বলের উপরে গৌরবর্ণ দীপ্র চেহারা যেন আগুনের মতো জ্বলছে। মনসা পাহাড়ের অভিজ্ঞতায় পথেঘাটে এখন সাধু সম্বন্ধে সাবধান হয়ে গিয়েছি। কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখি। খুবই লম্বা-চওড়া শরীর। উপবিষ্ট অবস্থায় দৈর্ঘ্য প্রায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার সমান। ধীরে ধীরে মুদিত চোখ দুটি খুলে সোজা তাকালেন। মুখে চোখে হাসির ঝলক 'দাঁড়িয়ে কেন মা, সামনে এসে বসো।' কি সহজ প্রসন্ন ভাব। যেন আমার আসারই কথা ছিল। যেন আমার জন্যই তিনি এতক্ষণ দুচোখ বুজে অপেক্ষায় ছিলেন। সামনের অপরিসর জায়গাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কোনোমতে পা মুড়ে বসলাম। দুজনের মধ্যে দুহাতেরও তফাত নেই। কাছে থেকে দেখছি সাধুর মুখের রেখায় আশ্চর্য কোমলতা। নিশ্চয়ই বাঙালী শরীর। এত বিশাল দেহে এমন নরম লাবণ্য ফুটে উঠেছে, এঁকে সাধুর কঠোর জীবনের ভূমিকায় ভাবতে কেমন ভাল লাগে না। মনে পড়ছিল গৌরাঙ্গের ছবি। স্নেহময়ী শচীদেবী, রূপসী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে নবযুবক নিমাইপণ্ডিত যখন মুণ্ডিতমস্তকে গেরুয়া ধারণ করে নীলাচলে

যাত্রা করলেন, তখন নিশ্চয়ই এমনি কোমলকান্ত সন্ন্যাসীমূর্তি ছিল তাঁর। হিন্দুশাস্ত্রে বার্ধক্যেই বানপ্রস্থের বিধি। জৈবধর্মের নিয়মানুসারে তখনই কামাবশায়িতা সাধারণ বুদ্ধিতে অর্থাৎ কামনা-বাসনার অবসানে নির্বিঘ্নে মোক্ষচিন্তা সম্ভব। জোর করে ইন্দ্রিয়ের অবদমন ইন্দ্রিয়বশ্যতার চেয়েও খারাপ। তাতে ইন্দ্রিয়বশ্যতার তৃষ্ণা আছে, তৃপ্তি নেই। নিজের কাছেই নিজেকে লুকিয়ে চিরবুভুক্ষু মনে সে এক অশান্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এই প্রসন্ন মূর্তির কোনখানে সেই তৃষ্ণার্ত রুক্ষতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই। আবার শক্তিমান যৌবনই যে পারে জীবনের ভেতরের দাহকে ওপরের প্রদীপে তুলে ধরতে। সেই পারার দুর্লভ আনন্দের দিব্যঘট বুকে নিয়ে যেন ফেলে ছড়িয়ে বিলিয়ে দিতে চান ইনি। বড়ো সঙ্কোচ বোধ করলাম, 'মা' বলে কেমন সস্নেহে ডেকে বসতে বললেন। আমি তো 'বাবা' বলে সহজমনে পদস্পর্শ করতে পারলাম না। বয়স তো আমারই কাছাকাছি হবে, অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়। খোলা ঘন কালো চুল কাঁধের উপর ছড়ানো, জটা নয়। দেহে কোন বস্ত্র আছে কিনা বোঝা যায় না। দৃঢ়পদ্মাসনে বসে আছেন। হাতদুটি কোলের ওপর জড়ো করা। হয়তো উনি আমায় অভ্যাসেই মা বলে ডাকলেন। কিন্তু ঠিক ততটা বয়সের তফাৎ নেই বলেই কি- কিংবা জানিনা অন্য কোন কারণে ওঁকে দেখে আমার ঠিক অনুরূপ ভাব জাগলো না যেন সমবয়সী সঙ্গী-আত্মীয় হঠাৎ কৃতিত্ব দেখিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেইরকম মমতামেশানো দূরত্বের ভাব—ঠিক শ্রদ্ধা নয়, একটু স্নেহমেশানো সম্ভ্রম। সাধুও এতক্ষণ আমার দিকেই চেয়ে ছিলেন। ঝিকিমিকি হেসে ওঠা চোখের দিকে তাকাতেই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কুম্ভে কেন এসেছ মা?'

'দেখতে।'

'দেখতে! কি দেখতে? সাধু দেখতে?'

'সাধু দেখা কি আমার হাতে? আমি তাঁদের কি করে চিনব! তবে কেউ যদি দয়া করে ধরা দেন তবে দেখতেও পারি।'

'ওই তো, মায়ের আমার একটু অভিমানও আছে।'. এবার সাধুর গলার স্বরেও কৌতুকের ছোঁয়া। কম্বলের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজের মোড়ক বার করে হাতে দেন। খুলে দেখি কয়েকটা লবঙ্গ আর এলাচ। প্রসাদ একটু মুখে দিয়ে বাকীটা আবার কাগজ মুড়ে ব্যাগে রাখি। আস্তানায় ফিরে সকলকে দিতে হবে। আজ আমার প্রসাদ পাবার দিন। ভোলাগিরি আশ্রমের সাধুও সস্নেহে প্রসাদ দিয়েছিলেন। কাল আমরা রওনা হব কলকাতায়। সকলেরই এখন যাওয়া যাওয়া মন। গোছগাছে ব্যস্ত। আমার মনটা অগোছালো করে দিয়েছিলেন মনসাপাহাড়ের সেই সাধু। অজ্ঞতাকে অশ্রদ্ধা বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। আমিই বা কেন তাঁকে সমগ্র সাধুসমাজের প্রতীক বলে ধরে নিয়েছি! আসলে অজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধা কোনোটাই নয়। নিজের মধ্যে অভিমানের বেলুনটাই খোঁচা খেয়েছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে গ্যাস বেরিয়ে ঘোর করে রেখেছে মনটাকে। আজ শেষের দিনে বিশ্বেশ্বরের অঙ্গনে এসে সেই ফুটো বেলুনটা ছিন্ন সুতো কেটে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে গেল। সাধু বললেন, 'কুম্ভে এসেছ, অমৃতসিঞ্চনে এখানে যে সবই শুচি, সবই সাধু। নিজের মনকে স্থির করে নাও মা, মনের বিকারেই তো যত ভেদাভেদ, যত অশান্তি।' সহাস্য, উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে মনে পড়ল শঙ্করাচার্যের অজ্ঞানবোধিনী

বর্ণধর্মাশ্রমাচারঃ শাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥

বর্ণ, ধর্ম, আশ্রম এবং আচার এ সমস্তই শাস্ত্রযন্ত্র দ্বারা আবদ্ধ। পিঞ্জর থেকে নির্গত কেশরীর মতো জগজ্জাল থেকে নির্গত হয়েছ তুমি। শ্রুতিনিরূপিত পথে আর তোমার চরণ বাধ্য নয়। বর্ণ ও আশ্রমের অভিমানশূন্য তোমার আত্মা শ্রুতি-মস্তকে বিচরণ করে।

'এত ভাবনার কি আছে মা, নাও জল খাও।'—পেছনে রাখা সোনার মতো কমণ্ডলু এগিয়ে ধরেন সাধু। এতক্ষণে খেয়াল হয়

তেষ্টায় গলা যেন ফেটে যাচ্ছে। অঞ্জলি বাড়িয়ে বললাম, 'আপনিই ঢেলে দিন।' কি মিষ্টি, ঠাণ্ডা জল। নিশ্চয়ই গৌরীকুণ্ড থেকে তুলে এনেছেন। বাণীদি যখন গৌরীকুণ্ডে স্নান করছিলেন আমাকে কাছে এসে মাথায় জল দিতে ডেকেছিলেন। আলসেমি লেগেছিল বকুলের ঘন ছায়া থেকে উঠে আসতে। মনে আছে একবার শিবরাত্রির ভিড়ে তারকেশ্বরে গিয়ে পৌঁছেছি। বাড়ি থেকে স্নান সেরেই গিয়েছিলাম। পাণ্ডাঠাকুরের অনেক পীড়াপীড়িতেও দুধকুণ্ডে নামলাম না। প্রচণ্ড ভিড়। কুণ্ড থেকে স্নান করে ভিজে কাপড়ে সকলে চলেছে বাবার মাথায় জল দিতে। গর্ভমন্দিরে মহাদেবকে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে দূর থেকে বাবাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া বড়ো একঘটি জল এসে পড়ল ঠিক আমার মাথায়। শেষ অবধি সেই ভিজে কাপড়েই পুজো হ'ল।

আজ গৌরীকুণ্ডের ধারে বসে রাধার কথাই ভাবছিলাম। এবারে এলাহাবাদ থেকে একা একা কুম্ভে চলে আসা রাধা আমার বড়ো অচেনা। আসলে নিজেকেই কি নিজে ঠিক মতন চিনি আমরা। তাই চারদিকে চেনা মুখের আদলে নিজেকেই চিনতে চাই। কাল বিকেলে মণিকা আর রাধা বেরোবার সময় বলল, 'মিতুদি, আমরা দুজনে একটু বেরোচ্ছি।' জার্নালিস্ট আর তাঁর স্ত্রী অনেক আগেই দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো আগে থেকেই ঠিক করা ছিল কোথাও একসঙ্গে মিলে কনখলে গিয়েছিল ওরা। হতে পারে হঠাৎ দেখা হয়ে ওদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। মায়াদিদের সঙ্গে দেখা না হলে রাধার আমাকে একথা বলারই দরকার ছিল না। নিজের চিন্তার গণ্ডিতে নিজের মনের ভেতরেই আচমকা ধাক্কা লাগে। হাতের জলটা কাপড়ে মুছে উঠে দাঁড়াই। সাধুর তেমনি হাসিমুখ। হাত বাড়িয়েও পায়ে হাত দিতে পারলাম না। শুনেছি শুদ্ধাত্মা সাধুপুরুষরা সংসারীজীবের তামসিক স্পর্শ সহ্য করতে পারেন না। কামনাবাসনাময়

দেহের স্পর্শে তাঁদের জীবন্মুক্ত দেহে বিকার ঘটে, জ্বালা ধরে। কোনো কোনো ভক্তের প্রণামের পর সর্বংসহা সারদাদেবীও 'পা জ্বলে গেল' বলে তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলেছেন। কে জানে, এ সাধুও হয়তো বলে বসবেন, তোমার ছোঁয়া লেগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। গাল বাড়িয়ে চড় খেয়ে লাভ কি।* কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁকে একবার ছুঁতে। সাধুর যে পূত স্পর্শে লোক-পাবনী ভাগীরথী পর্যন্ত পবিত্র হন, সেই অমোঘ স্পর্শের প্রভাব শিরার মধ্যে একবার অনুভব করতে। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, কি বোকা আমি! সেই দিব্য আগুন কি ছোঁয়া যায় এই রক্তমাংসের আবরণী ত্বকে? শব্দ, স্পর্শ, দৃশ্য, গন্ধের ইন্দ্রিয় সীমার অনেক ওপরে সেই অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়বদ্ধ সত্তায় আমরা কেবল কামনা করতে পারি, কখনোই ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে পারি না। করুণা করে হাতে তুলে দিলেও অক্ষম মুঠিতে ধরে রাখতে পারি না। কাঁচা মাটির ঘট অমৃত ধরে রাখবে কি, নিজের দুর্বলতায় গলে মিশিয়ে যাবে মাটিতে। সামনের দুপুরের আকাশের দিকেই চোখ তুলে তাকাবার শক্তি নেই কি করে অনুভব করবো সহস্রসূর্য সদৃশ্য সেই প্রখর তেজদীপ্তি—

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।

তাকে ছুঁতে না পারি, সে যে আছে এই অস্তিত্বের আনন্দেই আলোকিত করে দিল সমস্ত চেতনা। যেন নিজের মনেই সাধু বললেন, 'চেষ্টায় সব হয়। এ জন্মে না হয় পরজন্মে। না হয় আরো কত জন্মান্তর অপেক্ষা করে আছে। শিশু কতবার পড়তে পড়তেই চলতে শেখে। পড়া থেকে বাঁচাতে ধরে রাখলে সে যে কোনোদিনই চলবে না।' সেই সহাস্য প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভেতরটা কিরকম করে ওঠে। ভাবি আহা, বিকেলে রাধাকে একবার এখানে নিয়ে আসব। কত জায়গায় সাধু খুঁজে খুঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে বেচারী।

সাধু অমনি তাঁর হাতটি তুলে বলেন, 'আচ্ছা মা, তুমি ফিরে যাও। আমারও এখন এখান থেকে যাত্রা করার সময় হ'ল।' রামকৃষ্ণদেব বলছেন, তোমার আম খাওয়া দরকার তুমি আম খাও। আম বাগানের হিসাবনিকাশের তত্ত্ব জেনে তোমার কি হবে। নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নিচের রাস্তা ধরি। কে ইনি, কোথায় যাবেন কিছুই জানা হ'ল না। আর আমার জানবার ইচ্ছেও নেই। অমৃতফল যিনি অযাচিতে হাতে তুলে দিতে পারেন, প্রয়োজনে তার খবর জানাবার দায় তো তাঁরই। আমি জানি যে আমার ডাকে তিনি আসেননি। তাই আমার ধৃষ্টতায় চলে যাবেন এমন অনুশোচনাও হয় না। রাধার কথা তিনি আমার চেয়ে ভালো জানেন বলেই আমার পক্ষে ভুল জানাতেও আর ভয় নেই।

অনলবর্ষী দুপুরের পাথুরে পথ আজ হাল্কা পায়ে তরতর করে নেমে আসি। আজ আমার জন্য সকলে অপেক্ষা করে আছেন। তিনতলায় উঠে আনন্দর অনুযোগ, বাণীদির গঞ্জনা কোনকিছুর কোন জবাব না দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসি। রাধা চুপিচুপি হাসে, 'সেদিনকার আমার মতোই আজ তুমিও ইচ্ছেমতন খুব ঘুরে বেড়িয়েছ না? তোমাকে আজ বড্ড খুশী খুশী লাগছে।'

চোদ্দ

আজ রামনবমী। অযোধ্যায় কৌশল্যামায়ের কোল আলো করে আজকের দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন নরচন্দ্রমা শ্রীরামচন্দ্র। উত্তর-ভারতে এদিনটি বড়ো সমারোহে পালিত হয়। সকাল থেকেই আজ পথে পথে পুণ্যার্থী, নরনারীর ভিড়। মন্দিরা, করতাল, ঢোলক বাজিয়ে রামচরিত গান করে স্নানে চলেছে অসংখ্য ভক্ত নরনারী আমাদের রামপ্রসাদীর মতো সুরদাসীছন্দেরও সহজ দোলায় মনকে

বড় টানে। কানে শুনতে শুনতে মনেও কখন গুনগুনিয়ে উঠেছে সেই সুর—

রাম নাম কলি কামতরু, রামভক্তি সুরধেনু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ, গুরুপদপঙ্কজরেণু।
রামনামরতি রামগতি, রামনাম বিশ্বাস।
সুমিরত শুভ মঙ্গল কুশল, চাই দিশি তুলসীদাস॥

বিশেষ পুণ্যস্নানের যোগ আজ। কুম্ভযোগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ স্নান। আমাদেরও হরিদ্বারে শেষ দিন আজ। রামনবমীর পুণ্যস্নান সকাল সকাল সেরে নিতে তাড়া দিচ্ছেন বাণীদি। কারণ সাড়ে আটটা থেকে নাকি বারবেলা পড়ে যাবে। আজ সকলেরই একটু গয়ংগচ্ছ ভাব। যেন সারলেই তো সারা হয়ে গেল। অরুণদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অালটিমেটাম দিয়ে দিলেন, গঙ্গাস্নানে বারবেলা বিচার করলেই মহাপাপ, একেবারে সমূহ নরকবাস। বাণীদি রেগেমেগে একাই কাপড়গামছা গুছিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে রওনা হয়ে গেলেন। আজ বিকেল থেকেই উনি আমাদের দলছাড়া হবেন। আমাদের ট্রেন ছাড়বে সাড়ে ছটায়। ওঁর পঞ্জিকা অনুযায়ী সে সময় যাত্রা নাস্তি। দুন এক্সপ্রেসে স্পেশালের কয়েকটা টিকিট কাটা আছে। সে ট্রেন ছাড়বে আরো দেরিতে। বোধহয় সাড়ে আটটা নাগাদ। বাণীদি ঐ ট্রেনে যাবেন। পুরো কামরা রিজার্ভ না থাকায় এই কুম্ভের অরাজক ভিড়ে কষ্ট পাবেন খুব। কিন্তু অযাত্রার সময়ে যাত্রা করার চেয়ে ঐ কষ্টই ওঁর কাম্য। মণিকাও বলছে ঐ সঙ্গে যাবে। আমাদের ট্রেন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে লাক্সারে অপেক্ষা করবে। তারপর বেশী রাত্রে জোড়া হবে অমৃতসর এক্সপ্রেসের সঙ্গে। কলকাতায় পৌঁছতে পরশু বিকেল। দুন পরশু সকালেই পৌঁছে যাবে। কলকাতায় ফেলে আসা স্বামী আর ছেলের কথা এ ক'দিন একবারও মনে পড়েনি মণিকার। আজ যাবার দিন আসতেই আর নাকি মন মানছে না। কলকাতা থেকে একসঙ্গে এসেছিলেন ওঁর যে বান্ধবীটি

উনি অবশ্য রিজার্ভ বগির নিরাপত্তা ছাড়তে চান না। সর্পিলেকে প্রায় শেষ হয়ে আসা বাড়ির জন্য পেতলের পুতুল, সেন্টার টেবিলের তামার পরাত থেকে শুরু করে ডিভানের মলিদা পর্যন্ত সওদার যা বহর হয়েছে, তাতে অবশ্য রিজার্ভ বগিতে ওঁর না গিয়েও উপায় নেই। ভদ্রমহিলা কথা কম বলেন। শুধু বললেন যে জার্নালিস্ট দম্পতিও তো ঐ ট্রেনেরই যাত্রী। কাজেই ভিড় থাকলেও একসঙ্গে হৈচৈ করে আনন্দে চলে যাবে মণিকা। আরতিদি আমার দিকে তাকান। আমি জানালা দিয়ে আকাশ দেখি। আজ সকালে জার্নালিস্ট মিঃ দে সুবলবাবুকে জানিয়েছেন যে ওঁর সঙ্গিনী লক্ষ্ণৌ নেমে যাবেন। উনি নাকি সেখানকার মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। মিস্ সীমা বসুর নামে লীভট্র্যাভেলের রসিদ দিতে হবে। সুবলবাবু জিজ্ঞেস করতে এলেন রাধার কথা। ও-ও কি মণিকার সঙ্গে যাবে? রাধা আমাদের দলে যোগ দিয়েছে হরিদ্বারে এসে। রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে ওর সীট নেই। মণিকা, বাণীদি চলে গিয়ে দুটো সীট্ অবশ্য খালি হবে। কিন্তু আগরতলার মাসীমা মেসোমশাই যাবেন সে জায়গায়।

'আপনার বান্ধবীর কি ইচ্ছে? মণিকা না আপনি, কার সঙ্গে যেতে চান উনি?'

উত্তরে আমি রাধার দিকে তাকাই। সে হেসে বলে, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব। সীট্ না থাকলে আপনার সীট্টাই দেবেন আমাকে।'

'তাই দিতে হবে দেখছি। আমি আবার সুন্দরী মহিলাদের কথা ঠেলতে পারি না।' সুবলবাবু হাসতে হাসতে চলে যান যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। আমি রাধার দিকে তাকিয়ে থাকি। শুধু এ দুবছরে কেন, কোনোদিনই কি দেখেছি রাধাকে পরিহাসে তরল হতে! এই মেলা যে কতজনের সঙ্গে মনের মিল ঘটিয়ে দেয়। ভেঙে দেয় ছোটখাটো পাঁচিলের আড়ালে জমে থাকা অন্ধকারের বাসা।

রজনীগন্ধার বর্ণহীন বুকে রোদেজলে পোড়া কুম্ভের রং ধরেছে। জনহীন মায়াঅরণ্যের স্থির দর্পণের মতো সরোবর এখন জীবনের বিচিত্র আলোড়নে বিমথিত। জল নাড়লে চাড়লে ঘোলা দেখায় বটে, কিন্তু সেটাই স্বাস্থ্যকর জীবনের লক্ষণ। রাধার শূন্য মনে কুম্ভের বানের ঘোলা জল কতটা ঢুকেছে জানি না, এটা তো জেনে গেছি যে পোড়া কুম্ভ সহজে ভাঙে না। ইচ্ছেমতো তাকে পূর্ণ করো, শূন্য করো—সবই তো তখন নিজের হাতে। আজ রাধাই আমার হাত ধরে তোলে, 'চুপ করে বসে আছ কেন মিতুদি, চলো সকলে মিলে একসঙ্গে কুম্ভের শেষ ডুবটা দিয়ে আসি।' চলো চলো, আজ সবাই মিলে চলো ডুব দিতে। আগরতলার মাসীমা গল্প করছিলেন যে ওঁরা এর আগের তিনটে পূর্ণকুম্ভে উপস্থিত ছিলেন। চারকুম্ভে অবগাহন করে ব্রত সাঙ্গ হ'ল এবার। অত শখ আমাদের নেই। সামর্থ্যই নেই যে। ছোট্ট ঘট একেবারেই ভরে গিয়ে উপচে পড়ছে। চলতে চলতে রাধা গুনগুন করে সুর ধরে—

'কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে ?
মোর ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধুজল কেমন করে নে'ব তুলে ?'

ভোলাগিরির ঘাটেও আজ বেশ ভিড়। কোনমতে একধার দিয়ে সকলে জলে নামি। ওপারেও অসংখ্য লোক স্নান করছে। প্রখর স্রোত জলে। দ্রুতগতিতে ভেসে চলে যাচ্ছে গৈরিক গাঁদা ফুলের মালা। চন্দনবর্ণ ঢেউয়ের মাঝখানে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে চলেছে স্নিগ্ধশ্যামল সশীষ ডাব। পাণ্ডার ছেলেরা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে হাতের ধাক্কায় আরো দূরে সরে যায়। রাধা আপনমনে গেয়ে চলেছে,

'অনন্তকাল রবিশশী এই যে মহাসাগর হ'তে
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে।'

আজ বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশের উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝেই মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে আসছে। দূরের নীলপর্বতের রং একেবারে

অন্ধকার-ঘেঁষা। সাধুমহাপুরুষদের তপঃশক্তিতে অভিভূত হয়ে প্রকৃতি নাকি তাঁদের বশীভূত হয়। আমাদের সেই তপস্যার শক্তি নেই, কিন্তু ভালোবাসার সাধ তো আছে। এই গঙ্গা, ওই নীলপর্বত, উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে অসংখ্য ভক্তের চেতনায় কল্লোলিত হরিদ্বারের এই রূপকে এতদিন ধরে এই যে এতখানি ভালোবেসে গেলাম এই ছায়ার মাঝে তার কি কোন মূল্য ধরা নেই। রাধা আপনমনে গেয়েই চলে—

'স্বল্প আমার এ আধারে সে বাণী কি ধরতে পারে?
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্র'ও তোর চরণ ছুঁলে।'

'ওঠো ওঠো, তাড়াতাড়ি উঠে চলে এসো। গান গেয়ে আর মায়া বাড়াতে হবে না।' অরুণদা রাগের মাথায় তোয়ালেটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এ ক'দিনে ওঁর রাগের ধরনটা আমাদের চেনা হয়ে গেছে। বিদ্যুতের পেছনে অনেকখানি মেঘ জমে থাকে বলেই বজ্রের এত জোর গর্জন। এ ক'দিন খোলা ঘাটের দায়ে-অদায়ে অরুণদার ওই বিশাল বাথটাওয়েলটা আমাদের সকলেরই কাজে লেগেছে। চোখের সামনে অনেকগুলি সুখের মুহূর্ত একসঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে তীব্র স্রোতে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেজা কাপড়ের জল নিংড়োতে ভুলে গেছি আজ। বোঝা বড় বেশী ভারী মনে হচ্ছে। ভারী পায়ে সকলের পেছন পেছন মনোহরধামের আঙিনায় ঢুকে দেখি সামনে বিরাট ভাণ্ডারার আয়োজন। কপালে চন্দন-কুঙ্কুমের মস্ত টীকা লাগানো বিরাট পাগড়ী মাথায় বিশালকায় শেঠজী হাত জোড় করে সবাইকে অনুরোধ করছেন ভণ্ডারায় যোগ দিতে। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে হাত থেকে কাপড়ের বোঝাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'বহিনজী, আপনাকে কিন্তু না বসলে কিছুতেই ছাড়ব না।'

হেসে বলি, 'আমিও তো না বসে কিছুতেই ছাড়ব না। ভাণ্ডারার প্রসাদ লাভের এমন সুযোগ কি বারে বারে পাওয়া যায়!'

খুশী হয়ে ভদ্রলোক এবার অনুরোধ করেন সবার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিতে। আরতিদি, অরুণদা, রাধা, আনন্দ সবারই যথাযোগ্য পরিচয় প্রদান করি। এবার সুবলবাবুর পালা। উনি কে, জিজ্ঞেস করতেই বলি, 'উনি আমাদের পাণ্ডাজী। কলকাতা থেকে সবাইকে কুম্ভদর্শনে নিয়ে এসেছেন।' শুনে ভদ্রলোকের হাতের লাঠিটা মাথায় ঠেকিয়ে সে কি সভক্তি নমস্কার! 'মহাত্মা পাণ্ডাজী'র সেবার এমন সুযোগ আর কি উনি ছাড়েন! লাল স্পোর্টস্‌শার্ট আর শর্টস্ পরা পাণ্ডাজীকে হাত ধরে টেনে এনে পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দেন। নীচুগলায় বলি, 'আজকাল তো সত্যিকার সাধুমহাত্মারা ছদ্মবেশেই বেশী থাকেন। আপনাকে বোধহয় উঁচুদরের আত্মগোপনশীল মহাত্মা ভেবেছেন উনি।' বুদ্ধিমান সুবলবাবু কথা বাড়ান না। মোটা মোটা মালপোয়া আর ঘি গড়ানো পেস্তাবাদামের হালুয়ার সেবায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন।

এ রকমভাবে ভাণ্ডারায় প্রসাদ পাবার অযাচিত সৌভাগ্য আর একবার হয়েছিল। বছর দুয়েক আগের কথা। কাংড়া থেকে সকালে রওনা হয়েছি পঞ্চদেবী দর্শনে। সেদিন পাঞ্জাবের কি একটা গোলমালের ঢেউ লেগে সারা হিমাচল প্রদেশে বন্ধ্‌। তবে ওদের বন্ধ্‌ মানে আমাদের পশ্চিমবাংলার মতো সমস্ত জীবনযাত্রাকে অচল করে দেওয়া নয়! শুধু দোকান-পাট, রেস্টুরেণ্ট ইত্যাদি বন্ধ। বাস সার্ভিস ঠিকমতোই চলছে। আমরা জ্বালামুখী দর্শন সেরে যখন চিন্তাপূর্ণীতে এসে পৌঁছলাম তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। আগের দিন কিনে রাখা কিছু কলা আর আপেল ছিল সঙ্গে। আনন্দ বললেন, 'ভালোই হ'ল। তীর্থের পথে আজ বাধ্যতামূলক ফলাহার হবে।' কিন্তু চিন্তাপূর্ণীর চিন্তা ছিল অন্যরকম। অন্নপূর্ণা কি কখনো অতিথিকে উপবাসী রাখতে পারেন! পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, দেবীর গদি থেকে একজন কর্মচারী উঠে এসে বললেন, 'আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি ভাণ্ডারা হবে।' বাতিকগ্রস্ত বাঙালী আমরা। ভাণ্ডারার কথায় একটু

আমতা আমতা করে জানাই, তার দরকার হবে না। উনি তখন জোর করে বলেন, 'আপনাদের এখানে ভাণ্ডারায় প্রসাদ পেতেই হবে। আজ সব দোকানপাট বন্ধ। আপনারা বিদেশী, কোথায় খাবার পাবেন! এরমধ্যে দেখি মন্দিরের বাইরে উঁচু নীচু রাস্তার দুধারে ধুলোর ওপরেই সারি সারি মানুষ বসে পড়েছে। ছিন্নবাস ভিখারী থেকে শুরু করে বহুমূল্য স্যুটেড-বুটেড শৌখিন সম্ভ্রান্তরা বসে গেছেন পাশাপাশি। সকলে মিলে একরকম জোর করেই আমাদের বসিয়ে দিলেন। সামনে দিয়ে গেল শালপাতার থালা। তাতে গরম পুরী-তরকারী। তারপর ডাল-ভাত। আর সব শেষে হালুয়া। যে যত খেতে পারে বার বার অনুরোধ করে করে ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বাঙালী মাপের খাওয়ার পরিমাণ দেখে দুঃখ করে বললো যে এজন্যই বাঙালী এত দুর্বল। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এমনি ভাণ্ডারা এখানে রোজই হয়। দেবীর নিত্যপূজার বরাদ্দ ভোগ এমনি করে সকলের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াই এখানকার রীতি। একমাত্র পাণ্ডাঠাকুররাই মায়ের বরপুত্র হয়ে ভোগসেবার অধিকারী নন, দেবীর সন্তান সকলেরই তাতে সমানাধিকার। বড়ো ব্যথার সঙ্গে মনে হ'ল আমাদের কালীঘাটের কথা। মহাপ্রসাদ পেতে হলে কত মূল্য দিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এমনি অনায়াসে একপঙ্‌ক্তিতে প্রসাদলাভের বিধি শিখধর্মস্থানের লঙ্গরেও দেখেছি। কুম্ভমেলায় এ ক'দিন ঘুরে ঘুরে নানা অন্নছত্র, ভাণ্ডারার উৎসব চারদিকে চোখে পড়েছে। একান্ত ইচ্ছে হয়েছে সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেতে। কিন্তু স্পেশালের সম্ভ্রান্ত যাত্রী আমরা, আমাদের কি মানায় যেখানে সেখানে পাতা পেতে বসে পড়া! দলের অন্য সকাই দেখলে কি বলবেন! আমাদের খেতে বসে লুচি গরম না থাকলে অসুবিধা হয়, রান্নার একটু হেরফেরে প্রচুর চেঁচামেচি। শেঠজী আজ হাত ধরে বসিয়ে না দিলে এই অভিমানটুকু নিয়েই ফিরে যেতাম।

ভাণ্ডারা শেষে তিনতলায় উঠে দেখি শ্রীমান হরি বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছে।

'কেমন খেলেন ভাণ্ডারা ?'

'অপূর্ব !'

'তাতো হবেই। নিজের ঘরের রান্নাটা ছাড়া সবই অপূর্ব লাগে।' এঁই শ্রীমানদের সবই ভালো। খালি নিজেদের দ্রৌপদীর অবতার ভাবা ছাড়া। শোভনাদির রান্না পাতলা মরিচ ঝোল আমাদের চেটেপুটে খেতে দেখে হরি এবং নারায়ণ বলাবলি করছিল যে, এইবারে যত অদ্ভুত লোক এসেছে স্পেশালে। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে এসে ভালো ভালো তেলমসলার বদলে এইসব জলে সেদ্ধ অখাদ্য জিনিস তারা নিজেরা হলে কিছুতেই খেত না। আজ কিন্তু হরির কথায় আমায় চমক লাগে। অজান্তে বড় সত্যি কথাটা ধরিয়ে দিয়েছে। কুম্ভের এই ভিড়ে, এই পাশাপাশি ঠাসাঠাসি কাটিয়ে দেওয়া ক'টা দিনের ঘরকন্নার খেলাঘর কখন যেন সত্যি করে নিজের ঘর হয়ে গেছে। আজ যাওয়ার দিনে কথাটা না উঠলেই ছিল ভালো।

ঘরে ঢুকে দেখি সকলেই যার যার মালপত্র বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত। আজ দুপুরে আর শোওয়া নয়। চাদর তুলে ফেলা লাল লাল গদিগুলি যেন অনাবৃত শবদেহের মতো পড়ে আছে। আসার সময় যে উৎসাহে বসে বাক্স গুছিয়েছিলাম, এখন আর তার এককণাও অবশিষ্ট নেই। কোনোমতে স্যুটকেসে চেপেচুপে জিনিসপত্র ঢুকিয়ে তালা আটকে দিই। স্তূপীকৃত মোরাদাবাদী খেলনা, ফুলদানি আর ফলদানি কিনেছেন শোভনাদি। সাহাদা প্রশ্ন করেন, 'ঘুষের জন্য দুইখান নিছতো ?' কি ব্যাপার, আজকাল কি অফিস-টফিসে ঘুষের ব্যাপারেও ফুলদানি চলছে ? শিল্পসম্মত ঘুষ ? রাধা ব্যাখ্যা করে, 'ঘুষ মানে ঘোষ। সাহাদার প্রাণের বন্ধু 'ঘুষে'র কথা বলছেন না ক'দিন ধরে ? যার সঙ্গে তাস খেলতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছেন ?'

রাধার দিকে সকৃতজ্ঞ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে সাহাদা আবার পোশাকাদির শখের জিনিসগুলি ব্যবসায়িক নিপুণতায় থাকে থাকে তোরঙ্গ ভরে সাজাতে থাকেন। এদিকে রেণুদির সমস্যা রাশীকৃত রেকাবী আর ছুডজন প্যাঁচ লাগানো পেতলের ঘটি। কুম্ভের জল আর গঙ্গার প্রসাদ বিতরণ করবেন সবাইকে। আর সকলের জলের ক্যানগুলো তো কোন কিছুতেই ভরে নেওয়া সম্ভব নয়। দরজার পাশে সারি সারি দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল সেগুলি। আরতিদি ওঘর থেকে গোমড়ামুখে এলেন এক'টা কাগজের মোড়ক হাতে নিয়ে 'তোমাদের দাদার কাণ্ড দেখো! মৃগনাভি বলে খানিকটা কিসের গন্ধমাখানো লোম কিনে এনেছেন।'

হাতে নিয়ে দেখি চারটে গুটিপাকানো লোমওয়ালা চামড়ার মতো জিনিস। কস্তুরী আতরের মতো কড়া গন্ধ ছাড়ছে। রাধা হাত বাড়িয়ে কেড়ে নেয়, 'দেখি দেখি, বাঃ কি সুন্দর গন্ধ। আমি একটা নিচ্ছি কিন্তু।'

'একটা কেন, তুমি চারটেই নাও। ওই কিসের না কিসের লোম আমি কিছুতেই বাড়িতে নিতে দেবো না।'

'সে কি আরতিদি, মৃগনাভি বলে কথা! কবিরা পর্যন্ত পাগল যার জন্য। মনে নেই সেই—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম'

'হ্যাঁ, সেই পাগলকরা কস্তুরীমৃগের নাভি তোমাকে এখানে দশটাকায় চারটে করে দিচ্ছে।'

এতক্ষণে অরুণদা কথা বলেন,'সে তো জানা কথাই যে এ আসল কস্তুরী নয়। তবু তো হাতে করে ভাবলাম যে সত্যি মৃগনাভি আমার মুঠোয়। সেই ভাবনাটুকু আমি দশটাকায় কিনলে তোমার আপত্তি কি?'

'সেই কথাই বলো তাহলে। তুমি কৃপণমতি নয়, তার ভাবনা কিসের।' অরতিদিকে এরকম অসহিষ্ণু বক্তার দিতে কখনো দেখিনি। আজ বোধহয় সবার মনেই বাণীদির ছোঁয়াচ লেগেছে। এদিকে ওদিকে অনেক দিদিরই আজ গরম সুর। গঙ্গাস্নান করে এসে ভেজা চুল এখনো শুকোয়নি। কিন্তু মেজাজ যেন সব চৈত্রের খটখটে খড়ের চাল। একটু ফুলকি ছোঁয়ালেই হয়। এই রাগ আসলে ভেতরের কোমলতার ছবিটিকে ঢাকা দেওয়ার ছদ্মবেশ। এই পনেরো দিনের ঘরবসত ভেঙে ঘরে ফিরতে আজ কারোই মন চাইছে না। এ ক'দিন যে যার মনের মতো করে এখানে এত পেয়েছি—তার সবটুকু ভরে নেওয়ার জায়গা কোথায়। উপচে পড়া অনেকখানি যে এ ঘরেই ফেলে রেখে যেতে হবে। নেওয়ার জায়গা নেই তবু ফেলে যেতে ব্যথা—একি কৃপণতা মনের! রাধার দিকে তাকিয়ে দেখি সে মিটিমিটি হাসছে। অরতিদি বলছিলেন, 'এই পনেরোদিনে তো ওদিকে গরম অনেকটা বেড়ে গেছে। আর হরিদ্বারের এই ঠাণ্ডা রাত্রিগুলিতে আরো বদভ্যাস হয়েছে। আসার সময়ই ট্রেনে গরমে এত কষ্ট হয়েছে, যাওয়ার সময়ে না জানি কি হবে।'

রাধা বলে, 'আমি একটা সুন্দর উপায় বের করেছি। রোদ যখন চড়তে শুরু করবে, ভরা বর্ষার গান গাইবেন মনে মনে। দেখবেন কড়া রোদও কেমন নরম ছায়ায় ভরে আসবে। গ্রীষ্মের ঝাঁঝ মিলিয়ে যাবে যুথীবনের সজল সন্ধ্যার ছবিতে।'

অরুণদা বলেন, 'বুদ্ধিটা বের করেছ মন্দ নয়। কিন্তু সে সময় গান গাইবার জন্য তোমাকে পাওয়া যাবে তো?'

সেটাই তো আসলে সমস্যা। ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একবার যখন সুরে সুরে সাম এসে ঠিক মিলে গেছে তখন আর বেসুরের ভয় করি না। ঘট ভরার সংশয় নয়, এখন শুধু ভরা ঘটের সমস্যা। এখন যে কলস খালি ছাপিয়ে যেতে

চায়। তবুও যে শূন্যতায় ভয় করি, সে আমাদের স্বভাব। নিজের এই মানুষী ক্ষুদ্রতার প্রতিবিম্বে ঝিকিয়ে ওঠা বিরাটের ছবিতে অনাদিকালের যে অমৃতকুম্ভ আমার কাছে উন্মোচিত হ'ল তার অনিঃশেষ পাথেয় অন্তহীন পথেও অফুরান হবেই।

——